প্রথম অধ্যায়

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ ব্যক্তি জীবন

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সমকালের একজন উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বাঙালী-সমাজ জীবনে, বাংলা সাহিত্য জগতে ও বাংলার রাজনীতিতে তিনি যেমন উজ্জ্বল ছিলেন, তেমনি বিভিন্ন সময়ে সমালোচনার ঝড় উঠেছিল তাঁকেই কেন্দ্র করে। আমৃত্যু তাঁর জীবন সংগ্রামের সঙ্গী হিসেবেই বিশিষ্ট। এই অধ্যায়ে আমরা তাঁর জীবনের এই বিশিষ্টতা এবং ঘটনাবহুল জীবনবৈচিত্রের প্রকৃতি পর্যালোচনা চেষ্টা করেছি।

সৃষ্টি ও স্রষ্টার মধ্যে শাশ্বত সত্যরূপে নিহিত রয়েছে যুগ্মসম্পর্ক। সাহিত্য অনুধাবনে অবশ্যম্ভাবী সহায়ক হয়ে ওঠে সাহিত্যিকের জীবনযুক্ত সম্ভাব্য বিষয়। কেননা সাহিত্য স্রষ্টার হৃদয়-সমুদ্রের অতলে জীবন ও সৃষ্টি-রহস্য সমস্থিতি রূপে নিমজ্জমান থাকে। স্রষ্টা তাঁর মানবচৈতন্যের বিশেষ বোধজাত অন্তঃপ্রেরণা থেকেই সৃষ্টি করেন সাহিত্য। সাহিত্যিকের জীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের কথায় বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ও অধ্যাপক রবীন্দ্রনাথ গুপ্ত বিশ্বের বিখ্যাত গ্রন্থ 'ওয়্যার এ্যান্ড পীস'-এর কথায় লিখেছেন —''Everyman has a two-fold life ; on one side is his personal life which is free in proportion as its interests are abstract , the other is life as an element as one hue in the swarm ; and here a man has no chance of disregarding the laws imposed upon him .'' (সাহিত্যকোষ: কথাসাহিত্য, অলোক রায় সম্পাদিত, পরিবর্ধিত দ্বিতীয় সংস্করণ১৯৯৩, পৃ: ২১৭, সাহিত্যলোক, ৩২/৭ বিডন স্ট্রীট, কলকাতা ৬)

শিল্পীর ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যের সম্পর্কের কথায় বিশিষ্ট সাহিত্য সমালোচক ও অধ্যাপক ড: বিমলকুমার মুখোপাধ্যায় লিখেছেন — '' যদিও যা আছে ইহলোকে শিল্পের জগতে তা-ই আছে নানা রূপে ছড়িয়ে , তবু এই মস্ত পৃথিবীটা শিল্পকর্ম হলেও সাহিত্য, সংগীত ও চিত্রের জগতে শিল্পীদের কাছে তা নিতান্তই উপকরণ মাত্র। বস্তুজগৎ থেকে অভিজ্ঞতা মারফৎ সংগৃহীত এই উপাদান শিল্পী তাঁর মন , মস্তিষ্কও কল্পনার সাহায্যে গ্রহণ-বর্জনের দ্বারা এবং ব্যক্তিত্ত্বের স্পর্শে শিল্পমূর্তিতে সঞ্জীবিত করে তোলেন।'' (সাহিত্য বিবেক, দে'জ পাবলিশিং, চতুর্থ সংস্করণ,২০০৬,

পৃ: ১০)। লেখক তাঁর লেখার মধ্যে ব্যক্তিমানসের, সমাজ ও বিশ্বমানবের ক্রিয়ার অনুকরণকে প্রতিফলিত করে থাকেন। অ্যারিস্টটল তাঁর বিখ্যাত 'পোয়েটিক্স' গ্রন্থে এ সম্পর্কে বলেছেন—''স্পষ্টতই কাব্যের উদ্ভবের মূলে আছে দুটি কারণ, আর এই দুটি কারণ-ই মানুষের স্বভাবের মধ্যে নীহিত। শৈশব থেকেই অনুকরণ মানুষের স্বাভাবিক (বৃত্তি)। .....কাজেই অনুকরণ মানুষের স্বভাবগত ; ঠিক সেইরকম স্বভাবগত ছিল সুষমা ও ছন্দের বোধ। এইসব স্বাভাবিক প্রকৃতি ক্রমশই পরিণত হয়েছে এবং নানা পরীক্ষার মধ্যদিয়ে জন্ম নিয়েছে কাব্য।'' (কাব্যতত্ত্ব, অ্যারিস্টটল, অনুবাদ শিশির কুমার দাশ, প্রথম প্যাপিরাস সংস্করণ, তৃতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৪, পৃ: ৫২) ১৯৯৪ কাব্যের ন্যায় সাহিত্যের অন্যান্য ক্ষেত্রেও এই বিষয়টি একইভাবে প্রযোজ্য। উপন্যাস, ছোটগল্প, নাটক, প্রবন্ধ ইত্যাদি যেকোন ক্ষেত্রে লেখক তাঁর ব্যক্তিগত উপলব্ধিকে প্রতিফলিত করে থাকেন।

লেখকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ছোট গল্পের সম্পর্কের কথায় সাহিত্য সমালোচক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন— ''আর ছোটগল্প হল লেখকের ব্যক্তিত্বের-ই এক-একটি অভিব্যক্তি। নিজের সমাজ-পরিবেশ, শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং চারিত্রিক গঠন অনুযায়ী ছোট গল্পের লেখক যে প্রতীতি জীবন থেকে গ্রহণ করবেন, তা-ই তাঁর রচনায় ধরা দেবে। ছোটগল্প লেখকের ব্যক্তিত্বের-ই বিচিত্র-রঞ্জিত বিকাশ।'' (সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ, পৃ: ১৭৪) লেখকের ব্যক্তিজীবনের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্কের কথায় বিখ্যাত আইরিশ গল্প লেখক Sean O'Faolainতাঁর 'The Short Story` গ্রন্থে লিখেছেন—"In other words the short story is an emphatically personal exposition. What one searehs for and what one enjoys in a story is a special distillation, a unique sensibility which has recognised and selected at once a subject that, above all other subject, is of value to the writer's temperament and to his alone his lounterpart his perfect opportunity to project himself." (সাহিত্যে ছোটগল্প, নারায়ণ গঙ্গোঁপাধ্যায়, প্রথম মিত্র ও ঘোষ সংস্করণ, দ্বিতীয় মুদ্রণ১৪০৮, পৃ: ১৭৪)

সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সাহিত্য উপলব্ধি ও অনুধাবনে অত্যন্ত সহায়ক হয়ে ওঠে বিচিত্র অভিজ্ঞতাবলব্ধ তাঁর ব্যক্তিজীবন ও বিশিষ্ট দার্শনিক চেতনা। বিখ্যাত সাহিত্য সমালোচক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় এ সম্পর্কে বলেছেন—''অথচ যাকে বলা যায় গণ-কবিতা বা সাধারণ্যের কাব্য, তিনি সে রচনায় স্মরণীয় সিদ্ধির প্রমান রাখলেও তাঁর ব্যক্তিগত কণ্ঠস্বরে। .... কিন্তু আরেকভাগে তিনি রচনা করেছেন সেইসব কবিতা, যেগুলির বিষয়-বস্তুতে রাজনীতিক চেতনা থাক বা না থাক, কবিতাগুলিতে

পাওয়া যায় কবির সজাগ আত্মবীক্ষণের এক উজ্জ্বল নিদর্শন।'' (বাংলা কবিতার কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় দেজ সংস্করণ,২০০৮, পৃ: ২২৬-২২৭)। সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবন তাঁর সাহিত্যসৃজনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল। এসম্পর্কে তাঁর কবিতার আলোচনায় প্রখ্যাত অধ্যাপিকা ও সাহিত্য সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন —'' সুভাষের বাল্যজীবনে বাংলার গ্রাম ও বাঙালী সংসারের ব্রত-পাঁচালি, বাল্যক্রীড়া, প্রকৃতির শ্যামলতা, রান্না-খাওয়া-অভাব-আতিথেয়তা, প্রবাদ-প্রবচনময় ভাষা, মা-কাকিমা-ভাইবোনের মধুর প্রিয়সঙ্গ ইত্যাদি সম্পদের যে নিবিড় নৈকট্য ছিল .... এই সমৃদ্ধি ও স্বাতন্ত্র্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন বলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবি হিসেবে প্রথম থেকে নিজের আসনটিকে বিশিষ্ট চিহ্নিত করে নিতে পেরেছিলেন। সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকে এসেছিলেন বলে তিনি সাধারণ মানুষের ভাষাটি চমৎকার বুঝেছিলেন প্রথম থেকেই। তাই চল্লিশের দশকের জনমুখী কার্যক্রম যাঁদের রচনার রূপ পেয়েছিল তাঁদের অন্যতম ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়।'' (আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ ২০০৫, পৃ: ১৩০-১৩১) লেখক তাঁর ব্যক্তিজীবন ও জগতের বিভিন্ন অভিজ্ঞতার সঙ্গে যৌথ পরিণামে একাত্ম হয়ে সৃষ্টি করেনছিলেন সাহিত্য। তাঁর সৃষ্ট সাহিত্যে প্রাধান্য পেয়েছিল সমকাল, মানুষ, জগৎ ও দেশ। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর সাহিত্য এই বৃত্তের অর্ন্তভুক্ত —'' সমসময় ও সমকালীন সমাজকে আত্মী-করণ করে দৈনন্দিন জীবনের হলাহল কণ্ঠস্ত করে তিনি নীল-কণ্ঠ। তাঁর কবিতায় সমাজ দেশ কাল চেতনার স্পষ্ট ছবি পাই।'' (একালের কবিতা : প্রকৃতি ও প্রবণতা, অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্য ও ড: আদিত্য মুখোপাধ্যায়, পাণ্ডুলিপি, কলকাতা ৯, দ্বিতীয় সংস্করণ ২০০৯, পৃ: ১৫৩)

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গর্ভধারিণী ছিলেন শ্রীমতি যামিনী দেবী। নদীয়া-কৃষ্ণনগরের ভাষার মিষ্টতা তাঁর দখলে ছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভূমিষ্ট হয়েছিলেন ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারী বুধবার বাংলা মাঘ মাসের সংক্রান্তি তিথিতে নদীয়া কৃষ্ণনগরের মামার বাড়িতে। তাঁর জন্ম হয়েছিল দুই কালের সন্ধিক্ষণে, শীতের শেষ ও বসন্তের শুরুতে—

'' আমার মনের মধ্যে জন্মগত ছবি একটা আছে,
একেবারে শীতের শেষদিন।
পাতা নেই গাছে।
দুটি ঠোঁট শব্দ তুলে অন্য দুটি ঠোঁটে
ব'লে ওঠে:
'মনে নেই? কাল মধুমাস!' (কাল মধুমাস /কাল মধুমাস)

তাঁর জন্মের বুধবারের দিনটিকেও কবি ছন্দ ও ভাষার বন্ধনে আবদ্ধ করেছিলেন —''ভুলিনি, কারণ — / মা বলতেন: বুধবারে নখ কাটা আমার বারণ!'' (কাল মধুমাস/কাল মধুমাস) সুভাষ মুখোপাধ্যায় নদীয়ার ভঙ্গকুলীন বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। জন্মের বিষয়টি তিনি তাঁর আত্মজীবনীতেও উল্লেখ করেছেন —''স্থান: কৃষ্ণনগর। মা-র পেট থেকে আমি কাঁদতে কাঁদতে বেরিয়ে এসেছিলাম।'' (আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, প্রথম প্রকাশ ১৩৯৪, অরুণা প্রকাশনী , পৃ: ৮) তাঁর জন্ম রাশি কুম্ভ। সেখানে তিনি তাঁর ভাই-বোনদের সম্পর্কে লিখেছেন —''মা-র ছটি সন্তানের মধ্যে আমরা দু-ভাই আর এক বোনই কপালজোরে টিকে গিয়েছিলাম। দিদি ছিলেন সবার বড়।

আমি দু-ভাইয়ের মধ্যে ছোট হলেও মা-র ঠিক কোলের ছেলে নই। কারণ, আমার পরেও আমাদের এক ভাই হয়েছিল।'' (ঐ, পৃ: ১৮)। তাঁর বাবা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন আবগারি বিভাগের প্রসিকিউটর। তাঁর মায়ের গায়ের রঙ কালো ছিল বলে নাম হয়েছিল যামিনী দেবী। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে বংশ পরিচয়ের কথায় লিখেছেন —''আমার ঠাকুর্দা কিংবা ঠাকুর্দার বাবা তাঁর মামার বাড়ির সম্পত্তি পেয়ে নদীয়ার লোকনাথপুর গ্রামে উঠে আসেন। আমার ঠাকুর্দার মা কিংবা ঠাকুমা ছিলেন খুব জাঁদরেল মহিলা। ওঁদের আমলে আমাদের গ্রামে বিলের পাশে উঁচু টিবিতে ছিল সাহেবদের নীলকুঠী । গ্রামের লোকদের ওপর কী একটা অন্যায়-অবিচার করায় আমার ঠাকুর্দার মা বা ঠাকুমা নাকি লম্বা একটা বেত হাতে নিয়ে নীলকুঠির এক সাহেবকে তেড়ে গিয়েছিলেন মারতে।'' (ঐ, পৃ: ২১)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর মায়ের বাবাকে ডাকতেন দাদামশায় বলে। তাঁর দাদামশায় ছিলেন কালীমোহন বাড়ুয্যে। মাতৃকুলের সম্পর্কে আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন —''দাদামশায় ছিলেন বাড়ুয্যে। ডাক্তার। সহকারী সিভিল সার্জেন। যেকালে মুখ্যত সাহেবরাই সিভিল সারজেন হতে পারত, সেকালের পক্ষে বেশ উঁচু পদই বটে।

আমার দিদিমা ছিলেন কুড়িটি সন্তানের গর্ভধারিণী। তারমধ্যে বেঁচে ছিলেন দশজন। পাঁচ মামা আর মাকে নিয়ে পাঁচবোন। . . . . টাকাকড়ি, কাঁঠালপোঁতায় বাগানসুদ্ধ বিরাট বাড়িক — সব রেখে গেলেও, পাকা বুদ্ধির অভাবে সব নয়-ছয় হয়ে অতবড় সংসারটা শেষ পর্যন্ত ভেসে গেল।'' (ঐ, পৃ: ২৩)। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'গোবিন্দ' নামটি তাঁর ঠাকুর্দার দেওয়া। সেটাকে নিজের মতো করে তিনি ঢোলগোবিন্দ করে নিয়েছিলেন। তাঁর ঠাকুর্দার একটি ক্যাশ বাক্স ছিল। সেটা ছিল শিশু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে গুপ্তধনের মতো একটি কৌতুহলী বস্তু। সেখানে থাকত তাদের বাড়ির সবার কুষ্ঠি।

সেগুলি হলদে কাগজে লাল কালিতে লেখা গোল করে মোড়ানো থাকত। তাঁর জ্যাঠামশাই ছিলেন দীনেশ সেনগুপ্ত। আর তাঁর জেঠিমা তাঁদের মায়ের চেয়ে ছোট ছিলেন বলে তাঁকে তাঁরা কাকিমা বলে ডাকতেন। সেই কাকিমার ভারি সুন্দর ছিল মুখশ্রী ছিল। তাঁর চেহারায় একহারা গড়ন এবং গায়ের রঙ ধবধবে ফরসা ছিল। তাঁর দেশ ছিল বরিশাল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের আত্মজীবনীতে আমরা আরো দেখি যে, তাঁর এই কাকিমার ছোট্ট একটি মেয়ে ছিল—মঞ্জু। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই কাকিমার মৃত্যুর পর থেকে মঞ্জু তাদের সঙ্গেই থাকত। সে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের খুব 'ন্যাওটা' ছিল।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুর্দা ছিলেন ভঙ্গকুলীন। নদীয়ার সীমান্তে যশোরের সুমিদ্রে গ্রামে ছিল তাঁদের আদিবাস। তাঁর ঠাকুর্দা একসময় তাঁর বালবিধবা মায়ের হাতধরে নদীয়ার লোকনাথপুর গ্রামের অপুত্রক দিদিমার কাছে ওঠেন।এবং তিনি সেখানকার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। ফলে তাঁর ঠাকুর্দার সঙ্গে পিতৃকুলের আর কোন সম্বন্ধ থাকেনি। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ঠাকুর্দার ছিল চার ছেলে চার মেয়ে। তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বড় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বড় পিসিমা, বনগাঁর বাসিন্দা ছিলেন। তারপর তাঁর বাবা। তাঁর মেজোপিসির বিয়ে হয়েছিল আসানসোলে। কলকাতায় প্রসব হবার সময় তিনি উন্মাদ হয়ে যান। শেষে রাঁচির পাগলা গারদেই তাঁর মৃত্যু হয়। তাঁর সেজোপিসির বিয়ে হয়েছিল লোকনাথপুরের কুড়ুলগাছিতে। আর ছোটপিসিমার বিয়ে হয়েছিল দত্তপুকুরের কাছে হৃদয়পুরের গাঙ্গুঁলী বাড়ীতে। বড় পিসেমশাই ছিলেন পেশায় উকিল। তিন পিসির পর তাঁর তিন কাকার জন্ম হয়। তাঁর বাবার থেকে তাঁর ছোটকাকা বয়সে আঠারো-উনিশ বছরের ছোট। তাঁর বাবা ক্ষিতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছাত্রজীবনে গিরিশ বোসের মেধাবী ছাত্র ছিলেন। তাঁর বাবার কথায় আত্মজীবনীতে তিনি লিখেছিলেন —'' বাড়িতে আমরা বাবাকে যমের মতো ভয় করতাম। বাবার ছিল টানা নাক, মুখ-চোখও ভালো। ঘন কোঁকড়া চুল। গায়ের রঙ সাহেবদের মতো ফরসা। একটু লালচে। আমার তো ওঠেই না এমন কি আমার দাদা-দিদিরাও কেউ বাবার রঙ পায়নি। আমার মা কালো। আমিও কালো। বাবা আমাকেও ডাকতেন 'কালো' বলে। (ঐ, পৃ: ৫৪)। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের দাদা ও একমাত্র ভাইপো গান ভালো গাইতে পারতেন।

তাঁর বাবা শ্রী ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বড় ছেলে হিসেবে সংসারের সমস্ত ভার নিজেই সামলে ছিলেন। এ নিয়ে কখনো তাঁকে কোনো আফসোস করতে শোনেন নি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সে সম্পর্কে তিনি লিখেছেন—''বাবার সঙ্গে কাকাদের বয়সের বেশ তফাত ছিল। ছোট থেকেই তাদের বড় করার ভার বাবাকে নিতে হয়। পেনশন নেবার পর ঠাকুর্দা তাঁর সংসারটা বাবার ঘাড়ে ফেলে দিয়ে সম্পূর্ণ দায়মুক্ত হয়েছিলেন। এ নিয়ে পিতা-পুত্র দু-তরফেই বোধহয় একটা অস্বস্তির ভাব ছিল। বাবার

মধ্যে একটা গোঁ ছিল, হাজার টানাটানিতেও ঠাকুর্দার টাকা তিনি ছোঁবেন না। আবার মাঝে-মধ্যে ঠাকুর্দা দু-চারটে করে টাকা কাকাদের ধরে দিলে সেটাও বাবার চোখ এড়াত না। বাবা মনে করতেন, ঠাকুর্দা বুঝি এ বিষয়ে বাবার অক্ষমতাটা তাদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন।'' (ঐ, পৃ: ৫৭) পরিবারের এই আর্থিক অনটন সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে সারা জীবনই বহন করে চলতে হয়েছিল। তাঁর জীবনের বিভিন্ন সংগ্রামের মতো পরিবারের অর্থাভাবের বিরুদ্ধে লড়াই করাও একটি অন্যতম লড়াই ছিল।

সংসারের নানা অভাবকে উত্তীর্ণ করে সোজা হয়ে চলা এবং জীবনের নানা বোধের বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁর মা-বাবার প্রত্যক্ষ ভূমিকা আমরা দেখতে পাই। একমাত্র বড় পিসি ছাড়া, বিয়ে হয়ে আসার পর তাঁর মাকেই তাঁর ছোট ছোট কাকা-পিসিদের দেখাশোনা করতে হয়েছিল— ''ঠাকুমা না থাকায় বিয়ের পর থেকেই মা-র ওপর এসে পড়েছিল ছোটদের মানুষ করার ভার। সেজোকাকা ছোটকাকাও মা-রই আওতায় বড় হন।

যৌথ পরিবার থাকা অবস্থায় আমার যে সব খুড়তুতো ভাইবোনেরা জন্মেছিল, তারা সবাই আমার মা-র কোলেই মানুষ হয়।'' (ঐ, পৃ: ১৫৪)। তাঁর মা কেবল পরিবারের লোকদেরই নয়, বিভিন্ন সময় তিনি সমাজের সর্বশ্রেণীর মানুষের সহায় হিসেবে দাঁড়িয়েছিলেন —''মা-র কাছে ছোটলোক বড়লোক নেই। তা ছাড়া গরিব-গুরবোদেরই মা-কে বেশি দরকার। ওদের তো আর ডাক্তার-বদ্যি ডাকার মুরোদ নেই।''(ঐ, পৃ:১৪৮-১৪৯)। তাঁর ঠাকুর্দার মানা উপেক্ষা করেও তাঁর মা অনেক সময় মালোদের প্রসবের সহায়তায় ও নিজের কর্তব্যে অবিচল ছিলেন। তিনি মহামারিতেও মানুষের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন শ্বশুরের নিষেধকে উপেক্ষা করেই। কলেরা ও ওলাউঠার মত মহামারিতেও তিনি নির্ভয়ে মানুষের সেবা করেছিলেন—''.....পরের বিপদে মা-র বুক পেতে দেওয়ার ব্যাপারটাতে ঠাকুরদার আপত্তির ভাব বেশ কমে এসেছিল। কিন্তু ওলাউঠা রোগটা অত সহজভাবে তো আর নেওয়া যায় না। ছেলেপুলের বাড়ি। কোত্থেকে কী হয়ে যায় কে বলতে পারে?

মা ঠান্ডা মাথায় জানালেন, ময়লাগুলো সব পুড়িয়ে ফেলা হবে। সঙ্গে হাত ধোবার কারবলিক সাবান আছে। বাড়িতে লায়জলের জলে সব ভিজানো হবে। এতে ভয়ের কিছু নেই। '' (ঐ, পৃ: ১৪৯) তাঁর মা যামিনী দেবী তৎকালীন সময়ে ইংরেজ মেমসাহেবদের স্কুলে পড়াশুনা করেছিলেন। পরিবারের অভাবকে সঙ্গী করে যামিনী দেবী লড়াই করে গিয়েছিলেন আজীবন —''একটা ছেঁড়া-ফাটা সংসার সারক্ষণ সেলাই আর রিপু করে টেনেবুনে চালাতে হত। বাবা তো মাসকাবারে

মাইনের টাকাটা মার হাতে ধরিয়ে দিয়েই খালাস। তা দিয়ে তো হরিদাদার দইয়ের ভাঁড় হয় না। ফলে, অভাবের সংসারে অশান্তি ছিল নিত্যসঙ্গী। ..... মা-র কাছে শিখেছিলাম, ভাতের সঙ্গে আর কিছুই যদি না জোটে, এক-পলা সর্ষের তেল, নুন আর কাঁচা লঙ্কা কিংবা লঙ্কা পোড়া— ব্যস্।'' (ঐ, পৃ: ৬২-৬৩) তাঁর মাকে পরিবারের জন্য অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁর তেমন কোন দামি রঙিন শাড়ি পর্যন্ত ছিল না। সুভাষ মুখোপাধ্যায় বলেছেন বাইরে কোথাও গেলে তাঁর একটাই থাকত লালপাড় তাঁতের সাদা শাড়ি। বাহ্যিক সাজপোশাকে নিতান্ত আটপৌরে হওয়াকে সমকালীন সমাজ ও মানুষ সেদিন রেহাই দেয় নি — ''একবার এক বিয়েবাড়িতে গিয়েছেন। সেখানে এক অফিসারের বউ মা-র সাদাসিধে সাজসজ্জা দেখে এবং তারপর হাত দুটো ধরে মুখের কাছে এনে নাকি বলেছিলেন, 'এ মা! হাত-দুটোও যে একদম খালি। তোমার স্বামী বুঝি তোমাকে ভালোবাসে না?'

ব্যস, তারপরই বাড়ি ফিরে মা জানিয়ে দিয়েছিলেন এর পর থেকে আর কখনও তিনি কোনো নেমন্তন্ন-বাড়িতে যাবেন না। এরপর বাবাও কখনও মাকে তাঁর ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোথাও যাওয়ার ব্যাপারে কোনো জোরজার করেন নি।'' (ঐ, পৃ: ৬৩) মায়ের প্রভাবে মানুষের সেবা করা, দেশের ও দশের জন্য কাজ করা ও বাইরের জগৎকে ঘুরে দেখার প্রকৃতি তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল — ''মা ঠিকই বলেন। ঘরের বাইরে পা দিলে কত অজানা জিনিস যে জানা হয়ে যায়।'' পদাতিক কবির জীবনে ছিল দুরন্ত চলার গতি। রিপোর্টার সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও ভ্রমণকারী সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বাংলার মাঠ-ঘাট, নদ-নদী, সমুদ্র-বন্দর প্রভৃতি এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়ানোর ভিত্তিভূমি শিশুকালে মায়ের সেই দার্শনিক বীজমন্ত্র। গদ্যসাহিত্যের যে বিপুল সম্ভার সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাত ধরে বাংলা সহিত্যের ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিল; সেই সাহিত্য সৃষ্টির প্রকৃতি তাঁর মা গড়ে না তুললে আমরা হয়তো এই সম্পদ প্রাপ্তি হতে বঞ্চিত থাকতাম।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শিল্পমানস নির্মাণের প্রত্যক্ষ ও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল তাঁর বাবার। তাঁর বাবা ক্ষিতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় সরকারী চাকুরী করতেন। অসম্ভব আর্থিক কষ্টেও তিনি পরিবারের কাউকে অস্বীকার করেন নি। বরং ব্যক্তিস্বার্থের ঊর্ধ্বে সবার জন্য তিনি নিজেকে উজার করে দিয়েছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সততা ও মূল্যবোধের ভিত্তিভূমি নির্মাণে প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিল তাঁর বাবার। তিনি তাঁর বাবা সম্পর্কে লিখেছেন — ''হাজার চাপাচুপি দিলেও, কোনকিছুতে ঘুষের নামগন্ধ থাকলে ঠিক তিনি ধরে ফেলতে পারতেন। এসব ব্যাপারে বাবার সাংঘাতিক রকমের শুচিবাই বাড়ির আর কেউ খুব একটা পছন্দ করতো না। তারা বলতো আদর করে কিংবা খাতির করে কেউ যদি

LIBRARY
NBU. DARJEELING
271072
07 JUN 2014

পুকুরের পাকা রুই, বাগানের ফল তরকারি কিংবা দোকানের দইমিষ্টি পাঠায় — সেটাকেও ঘুষ বলে ধরে নিয়ে পত্রপাঠ ফেরত পাঠানোর কোনো মানে হয় ?'' (ঐ, পৃ: ৫২)

তবে তাঁর বাবার চেহারায় দৈন্যদশার এতটুকু চিহ্নও থাকত না। স্বভাব-চরিত্রে তিনি অত্যন্ত পরিষ্কার থাকতেন। আবার পোষাক-পরিচ্ছদ পরিমাণে কম ও নিতান্ত আটপৌরে হলেও তা সবসময় পরিষ্কার রাখতেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর বাবার কথায় বলেছেন —''বাবার ছিল অদ্ভুত স্বভাব। সবার সব ভার নিজে যেচে ঘাড়ে নিতে বাবার জুড়ি ছিল না।'' (ঐ, পৃ: ১৫৫) তিনি তাঁর বাবাকে দেখে এসেছিলেন ছেলেবেলা থেকে। সমাজ ও মানুষের সেবা করা তাঁর বাবার একটি মূল্যবান গুণ ছিল। সাধারণ মানুষের জন্যে কাজ করার প্রবণতার ভিত্তিভূমি ছিল তাঁর বাবা। সর্বজনের হাত ধরে মানুষের কাজ করার প্রকৃতি এবং লড়াই করার প্রবণতা জন্মসুত্রে তাঁর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। তাঁর বাবা ছিলেন আত্মমর্যাদাপূর্ণ ব্যক্তিত্বের অধিকারী ।তিনি তাঁর কথায় লিখেছেন —''বাবার আপত্তিতে আমাদের পরিবারের কেউ উদ্বাস্তু বলে নামও লেখায় নি।''(ঐ,পৃ: ৬০) তাঁর সাহিত্যজীবন ও দার্শনিক চেতনার ভিত্তি নির্মানে তাঁর মা ও বাবার প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা তাঁর রচিত সাহিত্যের নানা স্থানে তাঁর মা ও বাবাকে উপলব্ধি করি। তাঁর বাবার চাকুরী জীবনের সঙ্গেও সম্পৃক্ত তাঁর সাহিত্য সৃষ্টি। তাঁর বাবার বদলির চাকুরী সুত্রে শৈশবে তিনি বিভিন্ন জায়গা তাঁর দেখেছিলেন। জগৎকে ঘুরে ফিরে দেখা এবং তা নিজের জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে তোলা ক্রমশ: তাঁর জীবনের একটি প্রকৃতি হয়ে উঠেছিল। এভাবে ব্যক্তি জীবনের ভ্রমণপিপাসার সঙ্গে সাহিত্যধর্মের সম্পৃক্ততায় তিনি হয়ে উঠেছিলেন বাংলা সহিত্যের 'পদাতিক'।

কৈশরের অন্যতম সাথী রমাকৃষ্ণ মৈত্র তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যজীবনে মায়ের অনদানকে স্বীকৃতি জানিয়ে লিখেছেন —''কৃষ্ণনগরের মেয়ে বলেই বোধহয় যামিনীদেবীর নরম স্বরের সুরেলা কথাবার্তার মধ্যে একদিকে যেমন থাকত অসাধারণ মিষ্টি বাঁধুনি, অন্যদিকে পথ-চলতি কথ্য বাকধারার অজস্র প্রয়োগ। ফলে, বঁটিতে বসে আনাজ কুটতে কুটতে বা ভেজা হাত আঁচলে মুছে বাইরের কারো সঙ্গে যখনই যে-কথা বলতেন তাঁর মধ্যে ফুটে উঠত রুচি ও মাধুর্য ছাড়াও একটা ছন্দোময়তা। মার কাছ থেকে সুভাষ অফুরন্ত এই পথচলতি শব্দভান্ডার এবং তাঁর ব্যবহারে ছিরি-ছাঁদের কলা- কৌশলের প্রাথমিক জ্ঞান পেয়েছিল। পরবর্তীকালে তাঁর কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠবে এইসব শব্দের আকস্মিক প্রয়োগ এবং প্রচলিত পাঠ্য ছন্দকে সুবচনী মাত্রাতালে নিয়ে আসায় তা পাঠককে চমকে দিয়ে কাব্য-

উপভোগের পথে অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে যায় বলে আমার বিশ্বাস। . . .মা ছিলেন জননী বসুন্ধরার মতো।''(সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথা ও কবিতা, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, দে'জ পারলিশিং , পৃ: ৪১)

চলার পথে, সবার ও সবকিছুর থেকে যতটা সম্ভব রস নিংড়েনিয়ে নিজেকে একটু একটু করে পুষ্টকরে সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর দীর্ঘ সাহিত্যজীবন সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। সেই সঞ্চয়ে পুষ্টি যুগিয়েছিল অনেক খ্যাত-অখ্যাত চরিত্রও। সেই তালিকায় অসামান্য হয়ে ওঠেন একজন রান্নার লোকও — ''আমাদের রান্না করত যে, উড়িষ্যার সেই মোহনের আমি খুব ন্যাওটা ছিলাম। ফাঁক পেলেই আমি ওর কোলে চড়ে বসতাম। যতটা মনে পড়ে, মোহনকে আমি খুব ভালবাসতাম। অবশ্য ওর কোলে ওঠার আরেকটা আকর্ষণ ছিল ওর মুখের পান। তার স্বাদ এখনও যেন আমার মুখে লেগে আছে।''(আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৪, অরুণা প্রকাশনী, পৃ: ১৭)

বাল্যকালেই তাঁর জীবনে সংগ্রাম ও লড়াইয়ের অঙ্কুর হয়েছিল ।সেই সময় থেকেই তিনি জীবনযুদ্ধে জয়ী হবার আস্বাদ উপলব্ধি করে এসেছিলেন —'' তখনও আমার সাঁতারের জ্ঞান ঘাটের পৈঁঠে ধরে জলে পা ছোড়ার বেশি নয়। টুলো পন্ডিতমশাই এসেই আমাকে ধরলেন। বললেন, তুমি আমার কোমর ধরো, চলো তোমাকে বেড়িয়ে নিয়ে আসি।

ডাঙা ছেড়ে দূরে যাওয়ায় সে কী রোমাঞ্চ! আজও মনে পড়ে। পুকুরের মাঝবরাবর গিয়েছি। হঠাৎ সেই শয়তান লোকটা আমাকে ছেড়ে দিল। আমি ডুবে যাব। প্রাণপণে চেষ্টা করছি বাঁচতে। একবার যবি পাড়ে উঠতে পারি। দেখে নেব। একবার যদি—

কী করে যে পাড়ে পৌঁছুলাম! কেউ আমাকে উদ্ধার করতে এগোয় নি। নিজেই নিজেকে বাঁচালাম। কোনো রকমে জল খেতে-খেতে হাত পা ছুঁড়ে নিজেকে ভাসিয়ে। ঘাটে এসে গোড়ায় গুম হয়ে বসে রইলাম। তারপর আস্তে আস্তে রাগ পড়তে লাগল। মরা শরীরে জেগে উঠল এক অসম্ভব পুলক। আমি পেড়েছি। মৃত্যুকে পেঁড়িয়ে আসতে পেড়েছি।''(ঐ, পৃ: ১৪)

লড়াই, সাহস, ভয়, ভ্রমণ ইত্যাদি প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্য গুলির আদিমূল তাঁর শৈশব — ''ছেলেবেলায় চুল কাটতে যাওয়ার সেই ভয়টা আজ এই বুড়ো বয়সেও ভূত হয়ে ঢোলগোবিন্দর ঘাড়ে ভর করে রয়েছে। নাপিত দেখলে সাধে সে ডরায়?''(ঐ, পৃ: ১৬১) সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় শৈশবের শিক্ষাজীবন থেকেই একাধিক প্রতিষ্ঠিত ও বিদগ্ধ ব্যক্তির কাছে শিক্ষালাভ করেছিলেন এবং তাঁদের সংস্পর্শ পেয়েছিলেন। কৈশোরে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলেন ভারতবিখ্যাত পান্নালাল ঘোষ

মহাশয়কে —''গাঁট্টাগোঁট্টা চেহারা। কেষ্টঠাকুরের মতো কালো কুচকুচে গায়ের রঙ। বাঁশির কী মিষ্টি আওয়াজ। হঠাৎ আমার মনে হল যেন ভূত দেখছি। আরে, আমাদের কালোকোলো বক্সিংয়ের টীচার! তিনি কিনা বাঁশি বাজাচ্ছেন! দেখে সেদিন কি যে গর্ব হয়েছিল বলার নয়।

তবে বুক দশ হাত ফুলে গিয়েছিল আরও পরে। যখন জানলাম বোম্বাইয়ের ভারত বিখ্যাত বংশীবাদক পান্নালাল ঘোষ হচ্ছেন আমাদেরই ইস্কুলের সেই এককালে তিরিশ টাকা মাইনের বক্সিং টীচার পান্নাবাবু।'' (ঐ, পৃ: ১৫) এছাড়া তিনি বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন কবি কালিদাস রায়, কালি-কলম পত্রিকার সম্পাদক মুরলীধর বসুকে। বন্ধু হিসাবে পেয়েছিলেন বিখ্যাত সঙ্গীত শিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, রমানাথ রায়, পরিমল সেনগুপ্ত, কৃষ্ণবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, নির্মল চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ খ্যাত ব্যক্তিত্ব।তাঁর জীবনযুদ্ধের নান্দীপাঠ ছেলেবেলাতেই। সেদিনের খেলারছলেই রপ্ত করা যুদ্ধকে তাঁর সৃজনীশক্তি, ব্যক্তিজীবন ও সংগ্রামীমানস নির্মাণের ভিত্তিভূমি হিসেবে আমরা দেখি —'' এখনও মনে আছে, বাপরে বাপ! কী যুদ্ধ! বাখারিতে বাখারিতে ঠকাস-ঠক, ঠকাস-ঠক।

লড়তে লড়তে পা ফসকে উঁচু থেকে নিচু পাড়ে আমি পড়ে গিয়েছিলাম। প্রতিপক্ষ সুযোগ পেয়ে আমাকে যা পেটান পিটিয়েছিল বলার নয়। যখন উঠতে যাচ্ছি একজন ধমকে বলল — ওসব চলবে না, তুমি মরে গেছ। আমি মরে গেলাম। কিন্তু জীবনে দুটো বিষয়ে আমার সেদিন শিক্ষা হল।

প্রথমত, আমি মরলেও আমাদের দল কিন্তু জিততে পারে । লড়াই থেমে যাওয়ার পর আমি জানতে পারলাম যে যুদ্ধে আমাদের পল্টনেরই জয় হয়েছে।

দ্বিতীয়ত, জীবনে এই প্রথম দস্তুর মতো মালুম হল মার খেলে ভীষণ লাগে।'' (ঐ, পৃ: ১২-১৩) ছেলেবেলা থেকেই তিনি বিভিন্ন উপলব্ধি সঞ্চয় করেছিলেন —'' আমি যখন মধ্য কলকাতা ছেড়ে এসে দক্ষিণ কলকাতার সত্যভামা ইস্কুলে সবে ভরতি হয়েছি । টালিগঞ্জ থানার পাশের গলিতে থাকতাম । আমাদের ছেলেবেলার সময়টা বোধহয় বিপ্লবীদের প্রেরণায় শরীর চর্চার দিকে খুব ঝোঁক। নওগাঁয় কালিবাড়িতে শেখানো হত লাঠিখেলা, ছোরাখেলা। আমিও কিছুদিন শিখেছি।'' (ঐ, পৃ: ১৩) সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছেলেবেলায় যে টুলো পন্ডিতের সান্নিধ্যে ক্রমশ বেড়ে উঠেছিলেন সেই পন্ডিতও ছিলেন একজন স্বদেশী ও সংগ্রামী মানুষ —''আসছেন না দেখে দিন কয়েক পরে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনি, শেষ রাত্রে একগাড়ি পুলিশ এসে তাঁকে হাতে হাতকড়া দিয়ে ধরে নিয়ে গেছে। চালান দিয়েছে

সোজা জেলা সদরে। পন্ডিত সেজে ছিল। আসলে সাংঘাতিক লোক। গা-ঢাকা-দেওয়া স্বদেশি। ঘরে খানাতল্লাস করে একটা পিস্তলও নাকি পাওয়া গেছে।'' (ঐ, পৃ: ১৪)

তিনি আশৈশব পরিবারে দেখেছিলেন সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল—''দাদা গান গায়। ইংরিজি কবিতা আবৃত্তি করে। মেডেল পায়, প্রাইজ পায়। আমিও পাই গান গেয়ে, আবৃত্তি করে।''(ঐ, পৃ: ৭৭) ছেলেবেলা থেকেই তাঁর গানের গলা ভালোছিল। খুবই ছোট থেকে তিনি ভালো কবিতা আবৃত্তি করতে পারতেন। তবে অসুস্থতার কারণে শরীর তাঁর জীবনের লড়াইটাকে আরো কঠিন করে দিয়েছিল —''বছর বারো বয়সে আমি একবার যাই-যাই হয়েছিলাম। টাইফয়েডে। সেই এক ধাক্কায় তিনটে জিনিস আমি হারাই। গানের গলা। চোখের নজর। আর স্মৃতিশক্তি। একটা দাঁত নেই। একটা কান গেছে। সেসব তো অনেক পরে।''(ঐ, পৃ: ৮)

জীবনের ছোট ছোট ঘটনাগুলি তাঁর রচিত সাহিত্য জগতের একেকটি উপাদান হয়ে উঠেছিল। তাঁর সাহিত্য সৃজণের ও সংস্কৃতিমনের প্রকৃতি নির্মিত হয়েছিল শৈশবেই। পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠদের সততা, সত্যনিষ্ঠা ও মূল্যবোধ তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। ছেলেবেলা থেকেই তিনি তাঁর পিতামহের মুখে সংস্কৃত শ্লোক শুনেছিলেন। কাকিমার মুখে তিনি শুনেছিলেন কপালকুন্ডলা, দেবী চৌধুরাণী প্রভৃতি গ্রন্থ।

তাঁর জীবনে নওগাঁর একটি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। এরপর তিন-চার বছর বয়সে তাঁরা কলকাতা ছেড়ে বাংলাদেশের নওগাঁতে চলে গিয়েছিলেন—''নিতান্ত শৈশবকাল টুকু উত্তর কোলকাতায় কাটিয়ে পিতার কর্মস্থল রাজশাহী জেলার নওগাঁতে চলে যান তাঁরা যখন সুভাষের বয়স তিন কি চার বছর। নওগাঁতেই কাটে তাঁর দশ-এগারো বছর বয়স পর্যন্ত সময়। . . . যদিও খুব প্রত্যক্ষ ভাবে নয়, তবু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতার ভূমি ও ভাষা নির্মাণে এই নওগাঁর একটা স্থান আছে।'' (আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্ত্তী, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞা-বিকাশ সংস্করণ, ২০০৫, পৃ: ১২৪) সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনীতে নওগাঁ ও তার স্বভাব প্রকৃতিতে একাত্ম সম্মেলনীর কথা উল্লেখ করেছেন। ছেলেবেলার নওগাঁর সর্বশ্রেণীর মানুষের সঙ্গে একসঙ্গে মেলামেশা ও খেলাধূলা করার সুবাদে হিন্দু-মুসলমান ইত্যাদি সাম্প্রদায়িক বিভেদ তাঁর মনে আশৈশব জায়গা পায়নি। তাঁর বাবা ক্ষিতিশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ছিলেন চুপচাপ স্বভাবের মানুষ। সন্তান সম্পত্তিদের প্রতি তেমন কোন শাসন ছিল না। ফলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছেলেবেলায় নওগায় সর্বস্তরের ছেলে-মেয়ের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করতেন —''মফস্বল শহরে ছত্রিশ জাতের সঙ্গে সরকারী কোয়ার্টারে বাস করার ফলে

জাতের বালাইটা কখনই আমাদের মনে তেমন চেপে বসতে পারে নি। তা ছাড়া প্রতিবেশী মুসলমান পরিবারগুলোতে আমাদের ছোটদের ছিল অবাধ প্রবেশাধিকার। ঈদ্ বকরীদ মিলাদশরীফে আমরাও উৎসবে মেতে উঠতাম।'' (আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৪, অরুণা প্রকাশনী, পৃ: ৬৯-৭০)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় গ্রাম্য জীবনের সঙ্গে লীন হয়ে নওগাঁয় বেড়ে উঠেছিলেন। সেখানকার জীবনের গ্রাম্য প্রকৃতি , খোলামাঠ, ধূ-ধূ খেত, গ্রাম্য খেলাধূলার সঙ্গে তাঁর গভীর সখ্যতা ছিল —'' গোরুর গাড়ির ছইতে থেকে-থেকেই মাথা ঠুকে যাচ্ছে। গ্রাম ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে বলে ঢোলগোবিন্দর মন ভালো নেই। নইলে নলগাড়ির রাস্তা দিয়ে বৈঁচিফল খেতে খেতে দাদার সঙ্গে হেঁটে যেত। বাঁদিকে পড়ত জয়নালের বান। ডানদিকে আদিগন্ত আখক্ষেত। তারপর ঠেলে উঠত রামনগরের রাস্তায় ।'' (ঐ, পৃ: ১৫১) তাঁদের নওগাঁর বাড়ির ইঁদারার পাশে ঝোঁপগুলিতে আকাশের ঝিকমিকে তারার মতো জোনাকি পোকার দল তাঁর উপলব্ধিতে অসাধারণ সৌন্দর্য রূপে ধরা দিয়েছিল। বনজঙ্গল থেকে কাঁচপোকা ধরে নিয়ে এসে সে তাঁর দিদিকে পড়াতো। ছেলেবেলা থেকেই তিনি নওগাঁর বিভিন্ন পেশার মানুষের সঙ্গে আত্মিকটানে মেলামেশা করেছিলেন। সেখানকার মাঝি, কামার, কৃষক প্রভৃতি শ্রেণীর মানুষের সঙ্গে মিলেমিশে বেড়ে উঠছিলেন তিনি। সেখানে তিনি ভোর হতে না হতেই মাঝি পাড়ায় ছুটে যেতেন। সেখানে কামারেরা গরম লোহা ধরে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে যে স্ফুলিঙ্গের ফুলঝুড়ি পড়ত; তা তাঁর মানসচৈতন্যকে আলোড়িত করত। ছেলেবেলায় কিশোর সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রকৃতিতে আত্মস্থ হয়ে জগৎকে আপন করে নেবার অভ্যাস আয়ত্ব করেছিলেন —''বাঁ হাতের চেটোয় রাখা ঘুঁটের ছাই বা খড়ির গুঁড়োয়, হাটু-বার-করা লাল টৈটি গামছায়, চটা-ওঠা এনামেলের কাপে চায়ের ধোঁয়ায়, ময়রার দোকানে ফুটন্ত রসে ভাজা জিলিপির গন্ধে, গরম ফুলুরি গালে ফেলে উ: আ: শব্দে, ঢোলগোবিন্দ-র মনে আছে, সেকালে নেবুতলায় ভারি সুন্দর সকাল হত।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলত রাস্তায় রোদের খেলা। ঘোড়ার গাড়িগুলো যেত পায়ে-টেপা-ঘন্টায় ঘুঙুরের বোলতুলে। কচিকাঁচা রোদগুলো, ভয় হত, এইবুঝি গাড়ির তলায় পড়ে থেঁতলে যায়! ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ত যখন দেখতাম ডানপিটে ছেলেদের মতো সেই রোদগুলো টগবগিয়ে চলা ঘোড়ার ঝুঁটি ধরে গাড়ির চালের ওপর টকাস করে উঠে পড়ে পেছনের পা-দানি বেয়ে রাস্তার ওপর লাফিয়ে নামতেগিয়ে টাল সামলাতে না পেরে চিৎপাত হয়ে পড়ে যেত। অথচ রোদের গায়ে একটু আঁচড়ও লাগত না।'' (ঐ, পৃ: ৩১)

ব্যক্তিজীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিতান্ত ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত অনুভূতিপ্রবণ মনের অধিকারী ছিলেন। পড়াশুনার প্রাথমিক স্তরে ভালো-মন্দ, ধনী-গরীর উঁচু-নিচু সব শ্রেণীর সাথীদের সঙ্গে তাঁর সমান মেলেমেশা ছিল। সেসময় খেলার সাথীদের সঙ্গে তিনি খেলতে খুবই ভালো বাসতেন। আটবছর বয়সে তাঁকে মাইনর স্কুলে ভর্ত্তি করে দেওয়া হয়। সেই দিনগুলিতে বাবার হাতে মাখা দুধভাত তাঁর খুবই প্রিয় ছিল। তিনি তখন খোলা মাঠের ভেতর দিয়ে 'এবরো - খেবড়ো' রাস্তায় পায়ে হেঁটে বিদ্যালয়ে যেতেন। তাঁর মাইনর স্কুলের কথায় তিনি লিখেছেন —''দাদা-দিদির দেখাদেখি সকালে ঢোলগোবিন্দও ওর বই নিয়ে বসে। ..... একটু একটু করে এলেম বাড়ে। ফার্স্ট হয়। জয়দেব সেকেন্ড। কাশীরাম থার্ড। জয়দেব হেঁটে আসত অনেক দূরের এক গ্রাম থেকে। দুপুরে তখন টিফিন খাওয়ার তেমন রেওয়াজ ছিল বলে মনে পড়ে না। ছুটির সময় দেখতাম ওর মুখ শুখিয়ে আমসি হয়ে যেত। ওকে দেখে আমার খুব কষ্ট হোত। জয়দেব ছিল জাতে কামার। কাশীরামের বাবা ছিলেন আমাদের বাসার পেছনের সরকারি বাগানের মালি। ওরা দুজনেই ছিল আমার খুব বন্ধু। আরও একজনের সঙ্গে আমার ভাব ছিল। গাঁয়ের এক মুসলমান খেতালের ছেলে। বয়সে আমাদের চেয়ে অনেক বড়ো। লাস্ট বেঞ্চিতে বসত। বই কখন ছুঁত বলে মনে হয় না। সবাই ওকে দুর-ছাই করত। আমি মাঝে মাঝে ওর পাশে গিয়ে বসতাম।'' (ঐ, পৃ: ৭৫-৭৬)

আশৈশব বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। পারিবারিক পরিবেশের গুণেই সবার সঙ্গে একাত্ম হওয়ার প্রকৃতি তাঁর মধ্যে গড়ে উঠেছিল।নওগাঁয় গ্রাম্য পরিবেশে বিভিন্ন প্রকৃতির মানুষের সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। সেখানকার মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মেশার স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন—''আমাদের পাড়ায় তখন নবাগত অনেকেই। যেমন সান্টারা। মেসবাড়িতে সুশীল গুপ্ত। সুশীলদার বউ বি.এ. পাস। বিয়ের আগে ছিলেন মাস্টারনি। নি:সন্তান বলে বৌদির কাছে আমাদের আদরের শেষ ছিল না। পুকুরের পুবে যে দোতলা কুঠিতে মবিনুদ্দিনসাহেব থাকতেন, সেখানে এসেছেন রঞ্জিত চৌধুরী। ওঁর মেয়ে করুণা তখন এইটুকু। ওর কী একটা বড় অসুখে মা রাত জেগে সেবা করেছিলেন। সেই থেকে ওঁরা হয়ে গেছেন আমাদের আত্মীয়ের মতো।

মফস্বল জীবনে এইরকম হয়। আলাপ থেকে আত্মীয়তা জন্মাতে দেরি হয় না।'' (ঐ পৃ: ১৬৭) সেই সময়ে সুশীল গুপ্তের স্ত্রীকে তিনি বৌদি হিসেবে কাছাকাছি পেয়েছিলেন। তাঁর সেই বৌদি ছিলেন ঢাকার মেয়ে। তিনি ছিলেন 'প্রবাসী'-র অত্যন্ত আগ্রহী পাঠিকা। পরবর্তী কালে তাঁর এই বৌদিই তাঁকে প্রথম লেখালেখির কথা বলেছিলেন। এরকম বহু মানুষের সান্নিধ্যে তাঁর এই নওগাঁতেই

বহু মানুষের মঙ্গলসাধনে কাজ করার ও তাঁদের প্রতিনিধিত্বমূলক সাহিত্য রচনার মানস চেতনা নির্মিত হয়েছিল।

নওগাঁ জীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাছে পেয়েছিলেন কবি সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের বাবা ও তাঁর পরিবারকে —''হুমায়ুন কবিরের বাবা তখন নওগাঁয়। আমার জ্ঞান হওয়ার বয়সটা নওগাঁতেই কেটেছে। যতদুর মনে পড়ে, উনি খুব একটা ভয় পাওয়ার মতো লোক ছিলেন না।'' (ঐ পৃ: ৯) হুমায়ুন কবিরকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় দাদা বলে ডাকতেন। ছেলেবেলায় কবি সাহিত্যিক হুমায়ুন কবিরের সঙ্গে নওগাঁর স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন — ''ফুটবলের পোশাক পড়ে একদল ছোকরা ঘাটের পৈঁঠে ছেড়ে হুড়মুড় করে পালাচ্ছে। ঘাটের সিঁড়ির ওপর ছাড়া বেশ খানিকটা ধোঁয়া। পালাবার সেই দঙ্গলে দেখি হুমায়ুনদা। ধোঁয়াটা যে সিগারেটের তা তখনই বোঝা গিয়েছিল। কিন্তু হুমায়ুনদা তখন আর ইস্কুলের ছাত্র নন। ভালো ছাত্র হিসেবে সারা বাংলায় তখন তাঁর নাম। হেডমাস্টার মশাইয়ের ভয়ে তাঁকেও ছুটে পালাতে দেখে আমার সেদিন কী যে মজা লেগেছিল বলার নয় ।'' (ঐ, পৃ: ১১)

ছেলেবেলা থেকেই তিনি কুলীন ব্রাহ্মণের স্বাভিমানের সংকীর্তনতা থেকে মুক্ত ছিলেন। এই মুক্তজীবনের মহৎ দার্শনিক চেতণায় সৃষ্ট সাহিত্য পরবর্তীকালে তাঁর সৃজনীধারায় পাই আমরা। কৈশোরের বড় মনের সেই বন্ধুদের স্মৃতিকথায় তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন — ''শাজাহানদা ছিলেন কম-কথার মানুষ। পেছনদিকে একতলায় একপাশে ছিল তাঁর ঘর। জাহাঙ্গীরদা দিতেন ছোটদের পড়বার মতো বাংলা বই। ফিরোজ ছিল আমার ছেলেবেলার হলায়-গলায় বন্ধু।'' (ঐ পৃ:- ১০)

আমরা দেখতে পাই তাঁর সমগ্র সাহিত্যের একটি মৌলধর্ম — মানুষের মধ্যে জনজাগরণী সুরের দ্বারা তাঁদের ও দেশের মঙ্গল সাধন করা । নিজেকে দেশ ও মানুষের সেবায় নিযুক্ত করা এবং সার্বিক অত্যাচার, বঞ্চনা, বৈষম্য ও পরাধীনতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাই ছিল তাঁর জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য। তাঁর জীবনের এই মহৎ আদর্শের ভিত নির্মিত হয়েছিল ছেলেবেলাতেই, খেলার ছলে —''সন্ধে হলেই লণ্ঠন হাতে লোক পাঠিয়ে হুমায়ুন দার মা আমাকে আর দাদাকে ডেকে নিয়ে যেতেন। আর থাকত ফিরোজ। আমাদের নিয়ে বসত ওঁর গল্পের আসর। ..... অবশ্য আমাদের হিরো বলতে ছিলেন আকবরদা। আকবরদার ছিল দুটো গুণ। ছোটদের খুব কাছে টানতে পারতেন। আস্তে আস্তে তাঁর আওতায় আমাদের বড় একটা দল দাঁড়িয়ে গেল। না ধমকে, দাদাগিরি না ফলিয়ে মিষ্টি কথায় ছোটদের হাতে রাখার অদ্ভুদ ক্ষমতা ছিল তাঁর। আকবর দা আমদের সেনাপতি। যা বলতেন তাই আমরা শুনতাম। তাঁর অধীনে আমাদের নিয়মানুবর্তিতাটা ছিল স্বেচ্ছাপ্রণোদিত। ..... গোড়ায় শুরু হয়

খেলাধুলো দিয়ে। তারপর ড্রিল। এরপর রুটমার্চ। কুচকাওয়াজ। কী নয়। এমনিভাবে তৈরি হয়ে গেল আমাদের পলটন।'' (ঐ, পৃ: ১১)

ছেলেবেলায় তাঁর মফস্বলের প্রিয় খেলা ছিল ডাংগুলি, গাদি, চু-কিৎকিৎ, মারবেল, লাটু আর পলটনের সোলজার সোলজার খেলা। তাঁরা নিজেদেরকে এক একটি সোলজার ভেবে হাতে একটি করে বাখারি অর্থাৎ বাশেঁর ফালি দিয়ে ঠকাস-ঠক, ঠকাস-ঠক শব্দে যুদ্ধের খেলা খেলতেন ছেলেবেলায়। এই খেলার ছলে রপ্ত করা যুদ্ধই তাঁর জীবনযুদ্ধের মজবুত হাতিয়ার হয়ে দাঁড়িয়েছিল পরবর্তী জীবনে। ছেলেবেলা থেকেই ব্যক্তিজীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় যেটাই প্রতক্ষ্য করেছিলেন সেটাকেই গ্রহণ করে অভিজ্ঞতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করেছিলেন । তার আত্মজীবনীতে ধরা পড়েছে ছেলেবেলায় দেখা হাপুগান —''এই নেবুতলার গলিতেই আমি প্রথম দেখেছিলাম হাপু-গান। খালি গাঁ। হাতে একটা চাবুক। দু-কলি গান গাইছে আর তারপরই নিজের কালশিটে-পড়া পিঠে চাবুক মারতে মারতে মুখে আওয়াজ তুলছে : হা-পু ! হা-পু !'' (ঐ, পৃ: ৩৭)

তাঁর মেজকাকা ছিলেন প্রভাষ মুখোপাধ্যায়, যার ডাকনাম ছিল হারু। মানুষ হিসেবে তিনি ছিলেন অত্যন্ত বাস্তবজ্ঞানসম্পন্ন। তিনিই বিদ্যলয়ে নাম লেখানোর সময় কিছুটা নিজের নাম এবং কিছুটা স্বাধীনতা সংগ্রামী নেতাজী সুভাষ বোসের নামের সঙ্গে মিল রেখে তাঁর নাম লিখিয়েছিলেন সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। তিনি ছেলেবেলায় বন্ধুবৎসলের গুণটিকে অনুকরণ করেছিলেন সেই কাকার স্বভাব প্রকৃতি থেকে —''প্রথম জীবনে জামসেদপুরের টাটা কারখানায় মেজোকাকা পেয়েছিলেন অ্যাপ্রেনটিস হওয়ার, যাকে ইংরেজিতে বলে সুবর্ণ সুযোগ। কিন্তু বাড়ির জন্যে হুতুশে হয়ে সে কাজ তিনি ছেড়ে দেন। ওঁর সে সময়কার সতীর্থরা সবাই পরে টাটার বড় চাকুরে হয়ে গাড়িবাড়ি এবং সেই সঙ্গে প্রচুর টাকা করেছেন । কিন্তু তা নিয়ে পরে মেজোকাকাকে কখনও আক্ষেপ করতে শুনি নি।

নওগাঁয় ফিরে এসে মেজোকাকা তার বদলে দিলেন এক ষ্টেশনারি দোকান। এর পেছনে উৎসাহ যোগান মেজোকাকার আজীবন প্রাণের বন্ধু নারানকাকা। নেবুতলা লেনের কাছেই রমানাথ কবিরাজ লেনে ছিল নারানকাকাদের মস্ত পৈতৃক বাড়ি। ওঁরা ছিলেন সোনার বেনে। এ রকম নি:স্বার্থ বন্ধু-বৎসল মাটির মানুষ জীবনে আমি কম দেখেছি ।'' (ঐ, পৃ: ৫৮-৫৯)

তাঁর সেজমাসিমার সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব ছেলেবেলায় তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। জমিদারী উঠে গিয়ে তার সেজমাসিমা বিধবা হয়েও ছেলেমেয়েকে নিয়ে অতীব কষ্টে দিনযাপন করেছিলেন। অসম্ভব দু:খ লাঞ্ছনার মধ্যেও তাঁর সেজমাসিমা পদ্য লেখা ছাড়েননি এবং সেগুলির কিছু কিছু 'বিষাণ' পত্রিকাতেও ছাপা হয়েছিল।

ছোটবেলা থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় অত্যন্ত সংবেদনশীল মনের অধিকারী ছিলেন। তাঁর দাদা-দিদিদের গৃহশিক্ষকের কন্যা, তাঁর মরুনীদি ছিল দেখতে ভারী মিষ্টি। তাদের গোটা সংসারটাই তাঁর মরানীদি মাথায় করে রাখতেন। কল থেকে জল টেনে আনা, বাসন ধোওয়া, রান্নাকরা, কাপড়কাঁচা ইত্যাদি সব কিছু। মরুনীদির বিয়ে বলতে বাঁদরের গলায় মুক্তোর মালা। কেননা তাঁর স্বামী ছিলেন অত্যন্ত খারাপ মানুষ ও নেশাখোর। তাঁর মরানীদিকে বাপের বাড়ি রেখে তিনি পালিয়েছিলেন। সেই ঘটনা উল্লেখ করে আত্মজীবনীতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লিখেছেন —''মরুনীদির জন্য আমদের যে কী কষ্ট হত বলার নয়। কেবলি মনে হত ওর অখদ্যে স্বামীটাকে একবার হাতের মধ্যে পেলে হয়।'' (ঐ, পৃ: ৭৫)

পড়াশুনা ও সাহিত্যচর্চা ছেলেবেলা থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় পরিবার থেকে আয়ত্ব করতে শিখেছিলেন। বাংলা সহিত্যের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ছেলেবেলায় অসাধারণ ভূমিকা নিয়েছিলেন তার মেজো কাকিমা — যোগমায়াদেবী। তাঁর কথা সুভাষ মুখোপাধ্যায় আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন- —'' কাকিমার তখন কী-ই বা বয়স। সম্পর্কে পুত্রবৎ হলেও আমরা কাকিমার কাছে খানিকটা ভাইবোনের মতো ছিলাম। কাকিমার খুব পড়ার শখ ছিল। আমাদের পড়ে পড়ে শোনাতেন দেবী চৌধুরানী, কপাল কুন্ডলা।'' (ঐ, পৃ: ৭৫) ছেলেবেলায় তিনি শুনেছিলেন ঠাকুর্দার মুখে 'দোঁহাবলী', তাঁর মায়ের কাছে 'গীতা' 'রামায়ণ', 'ভাগবত', নরোত্তম দাসের 'শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তর শতনাম' ইত্যাদি মূল্যবানগ্রন্থ। এগুলি তাঁর কচিমনে মূল্যবোধ ও ঐতিহ্য সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দান করেছিল।

শৈশবে তাঁর মধ্যে দেশপ্রেম, সাহিত্যভাবনা, সামাজিকবোধ ও সংস্কৃতিভাবনার উন্মেষ ঘটানোয় প্রত্যক্ষ ভূমিকা নিয়েছিলন — বাল্যবন্ধু অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, তাঁর 'ঘটিকাকা' সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় ('উপাসনা' পত্রিকার সম্পাদক), অধ্যাপক সিদ্ধেশ্বর চৌধুরী (স্কটিশচার্চ কলেজ, ইংরেজী বিভাগ), ইতিহাসের ডক্টরেট তাঁর যোগেন কাকাবাবু, রবীন্দ্র সাহিত্যের সুপন্ডিত সুকুমার চট্টোপাধ্যায়, তাঁর নিখিল কাকাবাবু (অভিনেতা দিলীপ রায়ের পিতা), অমলেন্দু দাশগুপ্ত, তাঁর গোপালদা (সাহিত্যিক গোপাল হালদার), শম্ভু সিং, পটল মহারাজ অর্থাৎ বাসুদেবানন্দ ('উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক), সুশীল গুপ্ত, রায় সাহেব (নওগার এস. ডি. ও.), তাঁর আলুদা (কৃষ্ণেন্দু চৌধুরী) প্রমুখ। এঁদের অনেকের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিল পারিবারিক ও হৃদ্যতার সম্পর্ক। এঁদের বৈচিত্র্যেপূণচত্র্যণাবলীর সমাবেশ ঘটেছে তাঁর ব্যক্তিজীবনে ।

সহিত্যে তাঁর ভাষা প্রয়োগের অসামান্যতার গভীরে নিহিত তাঁর শৈশবে ভাষায় বৈচিত্রময় পরিচয়। তাঁর গর্ভধারিণীর মুখ থেকে তিনি গ্রহন করেছেন নদীয়া কৃষ্ণনগরের সুমিষ্টভাষা। আবার বাবার কর্মসূত্রে নওগাঁয় বসবাসের সময় সেখানকার রাজবংশী ভাষাগোষ্ঠীর ভাষাও তাঁকে ভীষনভাবে আকৃষ্ট করেছিল। সেই ভাষাকেও সাহিত্যে তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন — ''নিন্দালু-রে, রে- নিন্দালু ! এইঠে আইসো । কোঠেকার অ্যালায় বড় নোকের ছোয়া হইসে, বায় রে বায়।'....'বাপো গেইসে হাট, মাও গেইসে হাট, / মাও আনিবে মোলার নাড়ু, বাপ আনিবে খাট। / ওই খাটত চড়িয়া যাম বিন্দাবনের হাট। / বিন্দাবনের হাটতে নাউ ফলিসে। / নাউর উপর ঢোঁড়া সাপ ফপ্পেয়া উঠিসে।''(ঐ, পৃ: ১৮৩) এছাড়াও কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতার ভাষা প্রয়োগ, ভাব ও প্রবাদ ব্যবহারের শিল্পদক্ষতা ও এই নওগাঁ জীবনেই আয়ত্ব করেছিলেন তিনি।

তাঁর স্বভাব প্রকৃতি ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তার আত্মজীবনীতেই রাশিগত বৈশিষ্ট্যের কথায় তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেছেন —'' কুম্ভরাশির জাতক রুচিরোজগার করে নিজের মনের মতো কাজ করে। স্বাধীনতার পোকা মাথায় নড়ার দরুণ সে ফ্রী-লান্স বা ঠিকেয় লেখার কাজ নেয়। অন্যদিকে আদর্শের ভূত ঘাড়ে চেপে থাকে বলে রাজনীতি, সমাজসেবা, লোকশিক্ষা — এসব দিকেও ঝোঁকে। অনেকে বিজ্ঞান, কারিগরি, ইলেকট্রনিক, ইনজিনিয়ারিং, উদ্ভাবনা — এসব লাইনেও যায়। কুম্ভরাশির জাতকদের সবচেয়ে বড় মুশকিল এই যে, এরা প্রচণ্ড রকমের পরমত-অসহিষ্ণু। এদের একটু সরে বসো বলার জো নেই।'' (ঐ, পৃ:- ৭)

এগারো-বারো বছর বয়স পর্যন্ত নওগাঁয় শৈশব কাটিয়ে আবার কৈশোরে কলকাতায় আবার ফিরে আসেন সপরিবারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেকালের কলকাতার কথায় তিনি বলেন — ''হোসপাইপে গলা ফাটানো ঘোলা জলে রাস্তায় বান ডাকানোর শব্দ; বাঁশের-চোঙ-লাগানো চৌবাচ্চায় কলকণ্ঠে সকালের প্রথম জল আসার আওয়াজ; গলির দরজায় বাড়িতে ডাকাত-পড়ার মতো করে সাতসকালে ঠিকে-ঝির জোরে জোরে কড়া নাড়া; কলতলার এঁটো বাসনের দিকে চোখ রেখে ঘাড় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে পাশের বাড়ির কার্নিশে বসা কাকের গলা-চেরা কা-কা।'' (ঐ, পৃ: ২৯)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘ আটবছর নওগাঁয় খোলামেলা ধূ-ধূ মাঠযুক্ত উন্মুক্ত প্রকৃতিতে কাটিয়ে কলকাতায় ফিরে আসেন। সেখানকার নগর জীবনের কদর্যতা কৈশোরে তাঁর মানস পটে ছবি নির্মাণ করে দেয় —'' রাস্তার কলে ভিস্তিওয়ালার ভিড়। ড্রেনের জলে গা ধোয় একদল। হেঁইও হো, হেঁইও হো! সুর টেনে টেনে রাস্তার সুরকির ওপর দুরমুশ চালায় কর্পোরেশনের কুলি। ঘামের গন্ধে, বন্‌বন্

শব্দে জমজমাট শহর কোলকাতা। চুন-বালি-ইঁটেরও একটা সৌন্দর্য আছে। সন্ধাবেলা বড় রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখি ট্রামের তারে চক্‌মকির আগুন জ্বলে।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ , প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃ: ৪৬)। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই বহির্জাগতিক ছবিগুলি তাঁর পরবর্তী সাহিত্য জীবনের অন্তর্দৃষ্টিতে ভাষা, শৈলী, চিত্রকল্প ও শিল্পধর্মের বিভিন্ন উপাদান হয়ে ধরা দিয়েছে। সাহিত্যিকের এই শিল্পধর্মের ও ব্যক্তিজীবনের ঘটনাবলীর প্রভাব সম্পর্কে স্টিফেন স্পেণ্ডার যথার্থই লিখেছেন —''The result of that excessive outwardness of `a spiritually barren external world' is the `excessive inwardness' of poets who prefer losing themselves within themselves to losing themseleves outside themselves in external reality." (The Creative Element, Stephen Spender, Hamish Hamilton, London, 1953, page 21) সুভাষ মুখোপাধ্যায় নওগাঁর সমস্ত পেশার নানা সম্প্রদায়ের নানা অবস্থানের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে খেলাধূলা-নাচগান-যাত্রা-থিয়েটার প্রভৃতি নিয়ে একটি মুক্তজীবন কাটিয়েছিলেন দীর্ঘ আটবছর। সেখানেই তাঁর পড়াশুনা শুরু হয়। রাজশাহীর নওগাঁর মাইনর স্কুলে তাঁর শিক্ষার আরম্ভ। শুরু থেকেই তিনি পরীক্ষায় প্রথম স্থান অর্জন করেছিলেন। ক্রমে পড়াশুনায় তাঁর অসম্ভব আগ্রহ বাড়তে থাকে।

সেই সঙ্গে চলতে থাকে লেখালেখি। নওগাঁয় সুশীল গুপ্তের বি.এ. পাশ স্ত্রী শিশু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সর্বক্ষণের সঙ্গী ছিলেন। তিনি তাঁকে লেখালেখির হাতেখড়ি দিয়েছিলেন শিশু সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে। তিনি ছিলেন তাঁর প্রিয় বৌদি। একদিন এক ছুটির সকালে সেই বৌদি তাঁকে নির্দেশ দিয়েছিলেন —''আচ্ছা, আজ তোরা একটা দেশপ্রেম নিয়ে পদ্য লিখে আনতো।'' সেদিনের সেই নির্দেশই ছিল সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবন যাত্রার শুভ সূচনা। সেদিনের কথায় তিনি আত্মজীবনীতে লিখেছেন —''শেষ অব্দি বউদির কথা রাখতে পরের পর কয়েকটা লাইন সাজিয়ে তাতে আকাশ বাতাস জল মাটি বৃষ্টি শিশির এই গোছের চক্ষুগোচর মোটা মোটা কথা লিখে দিলাম। কাগজটা উল্টে-পাল্টে বউদি বললেন — এর মধ্যে দেশপ্রেম কোথায় রে? তাছাড়া এ তো পদ্যও হয় নি। '' (আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন, প্রথম প্রকাশ, ১৩৯৪, অরুণা প্রকাশনী, পৃ:-১৭০)

নওগাঁর জীবন কাটিয়ে বাবার হাত ধরে ১৯৩০ সালে এগারো-বারো বছর বয়সে কিশোর সুভাষ মুখোপাধ্যায় কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। কলকাতায় ফিরে তাঁর নওগাঁ জীবনের ফেলেআসা দিনগুলির জন্য তাঁর খুব কষ্ট হয়েছিল। কলকাতায় ফিরে এসে প্রথম দিকে কিছুতেই কলকাতাকে

আপন করে নিতে পারছিলেন না কিশোর সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কলকাতার অক্রুর লেনের এক গলির ভাড়াবাড়িতে সেদিন তাঁদের পরিবার উঠেছিল। সেদিনের স্মৃতিকথায় তিনি লিখেছেন —''এসে উঠলাম খাস মধ্য কলকাতার এক গলিতে। চারিদেকে গলা-বাড়ানো বাড়ি থাকায় আমাদের বাড়িটাতে রোদ পড়তে পেত না । রোদ-হাওয়া গায়ে ছোঁয়াতে হলে ছোট গলি ছেড়ে বড় গলিতে গিয়ে দাঁড়াতে হোত। যেখানে হাতে মাটি করবার মাটিটুকুও ফেরিওয়ালা ডেকে কিনতে হয় — আমি ভাবতাম, সে শহরে লোকে বাস করে কেন ?

এই ছাত্রজীবনে সুভাষ মুখোপাধ্যায় সত্যাগ্রহ আন্দোলনে বন্দী রামদুলাল বসুর বাবার সঙ্গে গিয়ে নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসুকে আলিপুর সেন্ট্রাল জেলে বন্দী অবস্থায় প্রত্যক্ষ করে এসেছিলেন। অগ্নিগর্ভ কলকাতায় বেড়ে উঠেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই স্বাধীনতা সংগ্রামের উত্তাল তরঙ্গ তাঁকে সেই কিশোর বয়সে প্রচণ্ড গতিতে আকর্ষণ করেছিল। প্রত্যক্ষ জীবনে রাজনীতিতে নিজেকে আত্মস্থ করতে থাকেন তিনি। নিজেকে যুক্ত করেন ছাত্র আন্দোলনের সঙ্গে ।সেকালে যদিও সেভাবে সংগঠিত না হলেও বিছিন্নভাবে ক্রমশ: দানা বেঁধে উঠেছিল কিছু সংগঠন। তৎকালীন সময়ে এগুলির বেশিরভাগই ছিল অসংগঠিত ও উগ্রপন্থী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের পরিচালনাধীন। কিশোর সুভাষ মুখোপাধ্যায় এই সময় এই রকমই এক ছাত্র সংগঠন - 'বঙ্গীয় প্রদেশিক কিশোর ছাত্রদল'- এর সঙ্গে জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই সময় তাঁরা প্রচণ্ড আবেগে পাড়ায় পাড়ায় ' বন্দেমাতরম্ ' ধ্বনিতে সামিল হয়ে ওঠেন। ছাত্র জীবনের সেই আন্দোলনের স্মৃতিকথায় তিনি বলেছেন —''বাড়িতে যখন কেউ থাকেনা, আমি আর কাকিমা ঘর অন্ধকার করে উনুনের আঁচে বেআইনী বুলেটিন পড়ি। ইংরেজের সিংহাসন টলোমল টলোমল করছে, স্বাধীনতা দূরে নয়। যত ভাবি তত আনন্দে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে। আমাদের বাড়ীওয়ালা গেছে জেলে আমাদেরই জন্যে, সারা দেশের ভালর জন্যে। আর আমরা ঘরে বসে থাকব ? (আমার বাংলা / সুভাষ মুখোপাধ্যায় গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৫, পৃষ্ঠা ৪৭-৪৮)

বিশেষ একটি রাজনৈতিক প্রেক্ষিতে তাঁর বুঝতে শেখার বয়স ক্রমশ পরিনতির দিকে এগিয়েছিল তাতে তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সাহিত্যে রাজনৈতিক দর্শন প্রতিফলিত হওয়াই সঙ্গত। এই পর্বে ১৯৩৫ সালে কিশোর সুভাষ মুখোপাধ্যায় সত্যভামা ইনস্টিটিউশন ছেড়ে অষ্টম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন ভবানীপুর মিত্র ইনষ্টিটিশনে। এই বিদ্যালয়েই তাঁর ছাত্র জীবনের অন্যতম অধ্যায় সূচিত। এই বিদ্যালয়ে পড়ার সময় তিনি ছাত্র জীবনে শিক্ষক হিসাবে পেয়েছিলেন কবিশেখর কালিদাস রায়, 'কালি ও কলম' পত্রিকার সম্পাদক মুবলীধর বসু, সাহিত্যিক অতুল চন্দ্র গুপ্ত, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত,

অঙ্কের শিক্ষক কেশব নাগ, গানে তাঁর নীতীনবাবু, ফনীবাবু, কালো যতীনবাবু প্রমুখ বিদগ্ধ পন্ডিত ব্যক্তিত্বকে। এই বিদ্যালয়ের পঠন-পাঠনের অন্যতম প্রিয় সঙ্গী ছিলেন অমরশিল্পী হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সাহিত্যিক রমাকৃষ্ণ মৈত্রকে। এই মিত্র ইনষ্ট্রিটিউশনে তাঁর সহপাঠীদের সুমধুর সখ্য তাঁর মধ্যে গঠিত করেছে — প্রেম, প্রীতি, মায়া ও মমতার দুর্ভেদ্য আবরণ। কৈশোর থেকে যৌবনের দিকে পা রাখার মুহূর্তগুলিকে তিনি সাহিত্যে যুক্ত করেছিলেন। এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সমান্তরাল বাংলাসাহিত্যের মধ্যগগনে অবস্থান করছিলেন — বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্ত্তী, বিষ্ণু দে, সমর সেন, নজরুল ইস্‌লাম, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকান্ত ভট্টাচার্য্য প্রমুখ সাহিত্যস্রষ্টা। সেই সময় একটু একটু করে সাহিত্যের ভান্ডার গড়তে প্রয়াসী ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেই সময়ের মিত্র ইনষ্ট্রিটিউশনে পাঠরত ছাত্রজীবনের সহপাঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন — হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, সাহিত্যিক রমানাথ রায়, কৃষ্ণবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায়, খেলোয়ার নির্মল চ্যাটার্জী, পরিমল সেনগুপ্ত, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, সুধীররঞ্জন মুখোপাধ্যায়, সন্তোষকুমার ঘোষ, জগদীশ বসু, জগৎ দাস, নারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, সুধাংশু সেনগুপ্ত, অরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।

ভবানীপুর মিত্র ইনষ্ট্রিটিশনে তিনি বিদ্যালয়ের স্কুল ম্যাগাজিন 'মৈত্রী'- তে নিজের লেখা ছাপিয়ে কবিতায় হাতপাকা করার চেষ্টা করেছিলেন। সেকালে পনেরো-কুড়ি লাইনের 'কথিকা' নামের আবেগপ্রবণ প্রচলিত পদ্য রচনায় তিনি যথেষ্ট সুনাম অর্জন করতে থাকেন। মিত্রস্কুলে দশম শ্রেণীতে পড়াকালে জমাখাতায় নিজেকে প্রকাশ করতে অসম-উদ্যোগী হয়ে উঠেছিলেন। সেই সময় 'উদ্বোধন' 'মুখবন্ধ' এবং 'স্মৃতি ও সঞ্চয়' ইত্যাদি কবিতা লিখে একটি কবিতার খাতা পূর্ণ করেছিলেন তিনি। সেই খাতাটির শুরুতেই 'স্মৃতি ও সঞ্চয়' শীর্ষক কবিতায় সেদিন আঠারো বছর বয়সে তিনি লিখেছিলেন — ''জীবন-জাহাজ মোর লবণাম্বু-সাগর সৈকতে / বার বার এসে লাগে। / বণিকের সে নয় বন্দর। মোর পথে / আফিমের বন যত জাগে। / আমার নেইকো কোন বাঁশী, /কোন আলো দীপ্র হয়ে ওঠেনি উদ্ভাসি; / সে তীরেই শুনি গান, /আর পাই আলোর ইঙ্গিত — /এ জাহাজে ভরে নিই নত চোখে সে মহান দান।'' (স্মৃতি ও সঞ্চয় / সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

যৌবনের সাহিত্যচর্চার নিদর্শনের ক্ষেত্রে এই পদ্যটিরও অসামান্য গুরুত্ব রয়েছে। এই সময় 'বিষাণ' পত্রিকাতেও তার কবিতা ছাপা হয়েছিল। 'বিষাণে' প্রকাশিত সেদিনের তার 'রবিবাবুকে' শীর্ষক কবিতাটি সেদিন তাঁর জাত চিনিয়ে দেবার সামর্থ্য অর্জন করেছিল। সেসময় তিনি 'কল্লোল', 'কালি ও কলম', 'প্রগতি', 'বিজলী' প্রভৃতি সাহিত্যি পত্রিকায় নিজেকে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। মিত্র ইনষ্ট্রিটিউশনের সেদিনের সেই দশম শ্রেণীর ছাত্র কলকাতার ভাবাণীপুর শাঁখারি পাড়া 'কল্যাণ সঙ্ঘ'

নামের গ্রন্থাগারের সাপ্তহিক ছুটির দিনের সাহিত্য-আসরে নিয়মিত একটু একটু করে নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছি। সেই সাহিত্যআসরে যোগদানকারীদের মধ্যে একটা সাহিত্য-চর্চার গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সেখানে স্বরচিত গল্প-কবিতা পাঠের পর তার হাড়, মাস ও মজ্জা নিয়ে তুমুল আলোচনা হত। কার রচনা সৃষ্টির কোন আলোকে উশকে দেয় কি না তার প্রতি তীক্ষ্ণদৃষ্টি রাখতেন সহিত্য আসরের অনতি প্রবীন লেখকেরা। সুভাস মুখোপাধ্যায়ের যৌবনে 'কল্যান সঙ্ঘের' সাহিত্য চর্চার স্মৃতিচারণায় তাঁর বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্র বলেছেণ —''বলা বাহুল্য, সুভাষের এই কবিতা লেখার বাতিকে আমদের সাহিত্যের প্রতি ঝোঁক নিষ্ঠা এবং চর্চা দ্রুত বেড়ে গিয়েছিল। 'কল্যাণ সঙ্ঘ'-র সাপ্তাহিক আসরটি ক্রমশ জমজমাট হতে শুরু করেছিল। বিশেষ বিশেষ আসরে আমরা প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুরেন্দ্র নাথ গোস্বামী, বুদ্ধদেব বসু , নন্দগোপাল সেনগুপ্ত, স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য্য প্রভৃতিকে আমন্ত্রণ করে আনতাম। ..... সুভাষ আনত ক্রমশ ধারালো হয়ে ওঠা এক-একটা কবিতা। সুকঠিন অনুশীলনের পথে তাঁর কবিতার অঙ্গসৌষ্ঠব এবং ভাবমূর্তি বদলাতে লাগল। এই পথে সে তার পূর্বসরীদের প্রভাবও কাটিয়ে উঠতে পেরেছিল। শব্দ ধ্বনি ও ছন্দ কুঁদে কুঁদে সে তার নিজস্ব কবিতা -প্রতিমা নির্মাণের কাজে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছিল। 'সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়' থেকে 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়'-এ উত্তরণ হয়েছিল।'' (দিগ্বিজয়ী পদাতিক, রমাকৃষ্ণ মৈত্র / সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, শঙ্খ ঘোষ, সৌবীন ভট্টাচার্য্য, অমীয় দেব, মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব বিশ্বাস সম্পাদনা, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৩১-৩২)

১৯৩৭ সালে ভবানীপুর মিত্র স্কুল থেকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় মাধ্যমিক পরীক্ষায় ইতিহাস ও সংস্কৃতে লেটার নিয়ে কৃতিত্বের সঙ্গে প্রথম বিভাগে সাফল্য হয়েছিলেন। এরপর তিনি আই. এ. পড়তে যান আশুতোষ কলেজে। সেই কলেজে আরো নতুন সহপাঠী হিসেবে পেলেন প্রফুল্ল চক্রবর্তী, ভবভূতি রায় প্রমুখ ব্যক্তিকে। এইসময় তিনি বাংলা সহিত্যের প্রেমেন্দ্র মিত্র, বুদ্ধদেব বসু, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, প্রবোধ সান্যাল, সমর সেন, বিষ্ণু দে প্রমুখ বাংলা সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখকের রচনা সম্যকদৃষ্টিতে দেখেছিলেন। ইংরেজী সাহিত্যেরও ডি.এইচ. লরেন্স, জেমস্ জয়েস, অ্যাল্ডুস হাকসলি, জর্জ বার্নাড শ' প্রমুখ সাহিত্যিকের রচনা অনেকটাই উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। ব্যক্তিগতভাবে অনেক শিল্পী-সাহিত্যিকের সে সময় সাহচর্য ও সংস্পর্শ পেয়েছিলেন।

এই সময়ের খ্যাতনামা সাহিত্যিক সমর সেন, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, আবু শয়ীদ আইয়ুব, অরুণ মিত্র, বিষ্ণু দে, অরুণ মিত্রের স্ত্রী তাঁর শান্তিদি, অমিয় চক্রবর্ত্তী, কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত, প্রবোধকুমার সান্যাল, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র, সুশোভন সরকার, জগদীশ গুপ্ত প্রমুখ সাহিত্যিকের অনেকের সঙ্গে তাঁর

সখ্যতা গড়ে উঠেছিল এই সময়। এঁদের অনেকের বাড়িতে আড্ডা দিয়ে দিয়ে আলাপ চারিতার মধ্যে তাঁর নিজের সৃজনীপ্রতিভা বিকশিত হতে থাকে। প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোডে কবি বিষ্ণু দে-র বাড়িতে, কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের পুরোনো কর্ণওয়ালিশ স্ট্রীটের বাড়িতে, পুরনো হরিশ চ্যাটার্জী ষ্ট্রীটে কবি প্রেমেন্দ্র মিত্রের বাড়িতে, কবি অমীয় চক্রবর্তীর এল্‌গিন রোডের ফ্ল্যাট বাড়িতে এবং যদু বাজারের কাছাকাছি পদ্মপুকুর রোডের একটি কানাগলিতে কবি যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের বাসস্থানে যৌবনের কাল থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিয়মিত যাতায়াত ও মেলামেশা করে নিজেকে সমৃদ্ধি করে তুলেছিলেন। সেই সময় যৌবনের প্রবল উদ্দীপনা, সাহিত্যসৃজনের প্রদণ্ডক্ষুধার সঙ্গে সম্মিলিতভাবে ক্রমশ প্রকাশিত হতে থাকে তাঁর রাজনৈতিক ঝোঁকও।

আশুতোষ কলেজে ঢোকার সময় থেকেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় যৌবনের প্রচন্ড উদ্দীপনায় মার্কসবাদী ভাবধারা ও রাজনৈতিক মত ও পথে আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর রাজনীতিতে প্রবেশের স্মৃতিকথা ও ঐতিহাস-সত্যের সমর্থনে তাঁর ছত্রজীবনের সহপাঠি রমাকৃষ্ণ মৈত্র লিখেছেন — ''আশুতোষ কলেজে ঢুকে খুব শিগ্‌গিরই আমরা মার্কসবাদী ভাবধারা ও রাজনীতির প্রতি আকৃষ্ট হই। কলেজে ছাত্রদের মধ্যে তখন বলশেভিক পার্টির প্রভাব বেশি ছিল। সে-সময়কার বিখ্যাত বলশেভিক ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ দুবে প্রায়ই কলেজে এসে তাঁর দলবলের সঙ্গে আলোচনায় বসতেন। সেসব আলোচনা-আসরে ক্রমশ আমাদেরও যাতায়াত শুরু হলো, এবং অল্পদিনের মধ্যেই আমরা লেবার পার্টির (বলশেভিক পার্টির প্রকাশ্য সংগঠন) ছাত্রকর্মী হয়ে গেলাম।

বিশ্বনাথ দুবে-র কাছে আমরা মার্কস, এঙ্গেলস, লেনিন ও স্ট্যালিন-এর মূল রচনার (অবশ্যই ইংরেজীতে) পাঠ নিতাম। হাজরা রোডের বাঁশতলার বস্তিতে দুবে-র খুপরিচালওলা ঘরে আমাদের গোপন ক্লাস হতো। দেবীপ্রসাদ, সুভাষ ও আমি এই ক্লাসের নিয়মিত পড়ুয়া ছিলাম। মার্কসবাদী সাহিত্যের ভারতীয় প্রকাশনা তখন নিষিদ্ধ ছিল। বিদেশের বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ করে বা খিদিরপুর ডকের সাম্যবাদী শ্রমিক বা নেতাদের সাহায্যে দু-চারকপি বই গোপনভাবে সংগ্রহ করা হতো এ ব্যাপারে দেবীপ্রসাদই ছিলেন অগ্রণী। তিনিই নানা সুত্র থেকে গ্রন্থগুলি জোগাড় করে আনতেন। বিশেষভাবে মনে আছে, বিলেতের লরেন্স উইসার্ট-এর প্রকাশিত 'A Handbook of Marxism' নামে মোটাসোটা একটি বই। পরে জেনেছিলাম, সমরবাবুই এই বইটি দেবী প্রসাদকে দিয়েছিলেন। এতে মার্কস-এঙ্গেলস-এর মূল রচনাগুলির প্রায় সবই ছিল। দুবে-র এই স্টাডি ক্লাসেই 'A Spectre is haunting Europe....' বিখ্যাত এই লাইনটি দিয়ে শুরু The Communist Menifesto

পড়তে পড়তে আমাদের গায়ের রোমগুলো খাড়া হয়ে উঠত।'' (দিগ্বিজয়ী পদাতিক, রমাকৃষ্ণ মৈত্র / সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮, পৃষ্ঠা ৩৭)

মার্কসীয় চেতনামূলক বিভিন্ন গ্রন্থপাঠে এইসময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর যৌবনের প্রচন্ড আবেগে সাম্যবাদী সমাজচেতনা ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রতি নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ডুবিয়ে রেখেছিলেন। এইসময় তাঁর চেতনায় জেগে উঠেছিল খেটেখাওয়া সাধারণ মানুষের প্রতি অটল ও দৃঢ় দায়বদ্ধ বোধ। তিনি এইসময় কমিউনিষ্ট মতাদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে খিদিরপুর ডকঅঞ্চলের শ্রমিক সংগঠনের কাজে যুক্ত হয়ে পড়েছিলেন। এইসময় একইসঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল পড়াশোনা, সাহিত্যচর্চা ও শ্রমিকসংগঠন। বজবজ ছাড়াও বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলের জেলে, কামার, কুমোর, তাঁতী, কারখানার শ্রমিক প্রভৃতি খেটেখাওয়া সমাজকে জাগিয়ে তোলার ও তাঁদের সংগঠিত করার লক্ষ্যে তিনি সদ্যবিবাহিতা স্ত্রীকে সঙ্গেনিয়ে দিনরাত একাকার করেছিলেন এই পর্বে।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৩৮ সালের শারদীয়া সংখ্যায় আনন্দবাজার পত্রিকায় তাঁর 'চীন : ১৯৩৮' কবিতাটি প্রেরণ করেছিলেন। এই কবিতাটি সেদিন প্রকাশের ছাড়পত্র না পেলেও এরপর সেটি পাঠকরে, কবি অরুণ মিত্র সেদিনের সেই প্রগতিশীল মানসের তরুণকবিকে ও তাঁর নতুনধারার সৃষ্টিপ্রয়াসকে সাড়াদিয়ে তাঁকে চিঠিতে আলাপের আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কবি অরুন মিত্র সেদিনের সেই ঘটনা সর্ম্পকে লিখেছেন —''সুভাষের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় কবিতার সূত্রে। সে তখন অতি তরুণ। আনন্দবাজার পত্রিকার কোনো এক বিশেষ সংখ্যার জন্য সে একটা কবিতা পাঠিয়েছিল। যিনি সে-সময়ে রচনা নির্বাচনের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন, তাঁর সেটা পছন্দ হয়নি, ফলে তিনি তা বাতিল করেন। তবে আমাকে দেখতে দেন এবং আমি লেখাটা পকেটে পুরে বাড়ি নিয়ে আসি। সেই প্রথম লেখায় কবির নাম ছিল সুভাষচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। এরপর যে-মুহূর্তে রচনা নির্বাচনের দায়িত্ব আমার ওপর বর্তাল, আমি সঙ্গে সঙ্গে চিঠি লিখে সুভাষকে ডেকে আনি এবং কবিতা দিতে বলি। তখন সে কবিতা দেয় এবং তা ছাপা হয়। কবিতাটা জাপানি ফ্যাসিস্টদের চীন আক্রমণ সম্বন্ধে :'জাপপুপকে ঝরে ফুলঝরি / জ্বলে হ্যাঙ্কাও'। তার কবিতার বৈশিষ্ট্য ছন্দনিয়ন্ত্রণ এবং শব্দপ্রয়োগের নতুনত্ব, প্রথম থেকেই আমাকে আকৃষ্ট করেছিল। এই কাব্যগুণের জন্যে এবং জনমুখী দৃষ্টির জন্যে তার কবিখ্যাতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে।'' (সুভাষ , অরুণ মিত্র / সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ পৃষ্ঠা ১)।

এরও আগে ১৯৩৭ সালে তাঁর 'সকালের প্রার্থনা' এবং 'রোমান্টিক' নামের দুটি কবিতা বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকায় প্রকাশের জন্য মনোনীত হওয়ায় তাঁর ডাকে সারাদিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেখা করেছিলেন। বিখ্যাত কবি ও কবিতা পত্রিকার সম্পাদকের আমন্ত্রন তাঁর কাছে সেদিন অপ্রত্যাশিত চমক বলে মনে হয়েছিল। ''..... কবিতা সম্পাদকের কাছ থেকে পাওয়া চিঠি আমার প্রথম চমক। একটি পোস্ট কার্ডে দুটি কবিতা মনোনীত হওয়ার দু-ছত্র খবরের তলায় একটি রোমহর্ষক নামের স্বাক্ষর — বুদ্ধদেব বসু। চিঠিতে আমাকে বলা হয়েছিল সুবিধে মতো আমি যেন একদিন যাই।'' (ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪, আনন্দ পাবলিশার্স প্রা.লি, পৃষ্ঠা ৮০) এইসময় তরুণ কবিকে আগ্রহ করে আমন্ত্রণ জানিয়ে তাঁর 'মে-দিনের গান' কবিতাটির জন্য যুগান্তর-এর সম্পাদক প্রবোধকুমার সান্যাল (রবিবাসরীয়-এর সম্পাদক) আলাপ করেছিলেন। পূর্ব্বাশা, যুগান্তর, কবিতা, পরিচয় অরনী, অগ্রনী প্রভৃতি পত্রিকা গুলিতে তাঁর কবি প্রতিভা ভাস্বর হয়ে উঠতে থাকে সে সময়।

সে সময় সাহিত্য জীবন সমাজ ও সংস্কৃতিতে দানা বেঁধে ওঠার সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিজীবনের প্রত্যক্ষ যোগসূত্র তৈরি হয় রাজনিতীর সঙ্গে। সে দিনের ছাত্র তরুন সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেবার পার্টিতে যোগ দেন ১৯৩৯ সালে। এই বছরেই তিনি কলকাতা আশুতোষ কলেজ থেকে আইএ. পরীক্ষায় সাফল্য অর্জন করেছিলেন। এই সময় তাঁর সঙ্গে বিখ্যাত ছাত্রনেতা বিশ্বনাথ মুখার্জীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। এই বছরেই তাঁর প্রভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় লেবার পার্টি ছেড়ে কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁর কলেজ জীবনেই গড়ে উঠেছিল রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ দর্শন এবং সাহিত্যজীবনের সুদৃর ভিত্তি। কলেজে ছাত্র সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৪০ সালে সর্বক্ষনের পার্টিকর্মী হয়ে ওঠেন। এই বছরেই তিনি বাংলা সাহিত্য জগৎকে প্রবল ঝাঁকুনি দিয়ে অসামান্য সারা জাগিয়ে পদাতিক গ্রন্থ নিয়ে তিনি তাঁর সৃজনী প্রতিভার বিস্ফোরণ ঘটালেন।

'পদাতিক' গ্রন্থটি কবি বুদ্ধদেব বসুর আগ্রহে এবং দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের বৃত্তির টাকায় 'কবিতা ভবন' থেকে ১৯৪০ সালের ফেব্রুয়ারী মাসের ২৩ টি কবিতা নিয়ে বাংলা সাহিত্য ভান্ডারে হাজির হয়েছিলেন। সেদিনের সেই সারাজাগানো কাব্যের কথায় সাহিত্য সমালোচক অধ্যাপক অশুকুমার শিকদার লিখেছেন — '' তিরিশ বছরেরও বেশি আগে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'পদাতিক' যখন প্রকাশিত হয়ে উঠেছিল তখন সঙ্গত কারণেই সাড়া পড়ে গিয়েছিল। সাড়া পড়ার একটা কারণ ছিল ঐতিহাসিক, অন্য কারণ কারু-রীতি গত । এই প্রথম একজন কবি রাজনৈতিক দলের মতবাদ পুরোপুরি মেনে নিয়ে, সেই মতবাদে দীক্ষিত হয়ে, দলভুক্ত রাজনীতির প্রতিনিধি হিসেবে বাংলায়

কবিতা লিখলেন।'' (আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, অরুণা প্রকাশনী , প্রথম সংস্করণ, ১৩৮১, পৃষ্ঠা ২৪৪) 'পদাতিক'-এ কবির যে জগৎ-বীক্ষা এবং আত্মবীক্ষণ রয়েছে, কবি এই গ্রন্থে যে একটি বিশেষ 'টোন' নিয়ে বাংলা কাব্যের ধারায় মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছেন তার মধ্যে নিহিত তার ব্যক্তিজীবন ও সমকাল — '' তিরিশ থেকে চল্লিশের মধ্যে এই শতাব্দীতে সমগ্র পৃথিবী যখন দার্শনিক , নৈতিক এবং অস্তিত্বগত নানা সংকটে মধ্যে দিয়ে চলেছে, যখন বিশ্ব নামক বৃহৎ ব্যাপারটি তাঁর প্রাত্যাহিক প্রত্যক্ষতা নিয়ে এই কোলকাতাতেও হয়ে উঠেছে প্রতিদিন পরিদৃশ্যমান , প্রতিদিন অনুভব গম্য, সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই সময়ে তাঁর কবিত্বে গড়ে পিটে নিয়েছেন। '' (সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, বাংলা কবিতার কালান্তর, দে'জ পাবলিশিং , দ্বিতীয় সংস্করণ পৃষ্ঠা- ২২৬)।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই 'পদাতিক' কাব্য গ্রন্থে নতুন সমাজ গড়েতোলার উত্তাল আহ্বান ও মানবিকতার প্রতি আত্মনিবেদনে বাংলা পাঠকের হৃদয় রসসিক্ত হয়ে উঠেছিল। এই অনুভূতির মূলে নিহীত তাঁর ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতার বিপুল সঞ্চয়। তাঁর 'পদাতিক' গ্রন্থ রচনার সঙ্গেঁ রাজনৈতিক চেতনা ও তাঁর ব্যক্তিজীবনের গতিপ্রকৃতি সর্ম্পকে স্বয়ং সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছাত্র ফেডারেশনের চল্লিশতম বর্ষমূর্তিতে মে মাসে (১৯৭৬) বলেছেন — যখন ছাত্র ফেডারেশনে যোগ দিয়েছিলেন তার কিছু আগেই তাঁর প্রথম কবিতার বই বেড়িয়েছিল। সাহিত্যে কিছুটা খ্যাতি হয়েছিল তাঁর। কিন্তু ছাত্র ফেডারেশন তাঁদের সঙ্গে কখনই একজন খ্যাতনামা লেখক হিসেবে ব্যবহার করেনি। একজন সাধারন ছাত্রকর্মী হিসাবেই দেখত। তাঁদের অফিস ছিল ভবানীদত্ত লেনে। ঘর ঝাঁট দেওয়া থেকে বড়দের টুকি-টাকি ফাইফরমাস পর্যন্ত খাটতেন। এই সবের মধ্যে দিয়েই সাহিত্যিক বা বুদ্ধিজীবী অভিমান কাটাতে পেরেছিলেন। ছোট কাজও শ্রদ্ধার সঙ্গে করতেন। পোস্টার লেখা, পোস্টার সাঁটা, স্ট্রীট কর্ণার করা , চাঁদা তোলা - এ সবই করতেন। এই সবের মধ্যদিয়েই সাধারন মানুষের কাছাকাছি যেতে পেরেছিলেন।

১৯৪০ সালে পদাতিক প্রকাশের সমকালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিষ্ট পার্টির কাছে সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব হয়ে উঠেছিলেন। এই সময়কালে তিনিও অবহিত হয়েছিলেন সে পার্টির সদস্য ও পার্টি কর্মীদের এবং তাদের মতামত। এই সময়ের ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক সুমিত্রা চক্রবর্তী লিখেছেন — '' যে উৎসাহে ও বিশ্বাসে ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিষ্ঠা-আকাঙ্খাকে মনের কোণে স্থান না দিয়ে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী ও সাম্যবাদী সংগঠনগুলির সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ১৯৪১-এর জুন মাসে জার্মানির সোভিয়েট দেশ আক্রমণে তা নতুন করে সংক্ষুব্ধ তরঙ্গাঁবর্ত সৃষ্টি করল। দ্রুত পরিকল্পিত হল নানাবিধ ফ্যাসিস্টবিরোধী কার্যক্রম। সুভাষ মুখোপাধ্যায় পুরোপুরি ঝাঁপিয়ে পড়লেন এই কর্মস্রোতে।

১৯৪১-এর ১৯ জুলাই 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় প্রকাশিত সোভিয়েট রাশিয়ার প্রতি বাংলার লেখক শিল্পী বুদ্ধিজীবীদের সমর্থনজ্ঞাপক এক আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের মধ্যে ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় । ২১ জুলাই টাউন হলে উদযাপিত 'সোভিয়েট দিবস' উপলক্ষে জনসভায় সামিল ছিলেন তিনি। সেখানেই স্থাপিত হয় 'সোভিয়েট সুহৃদ সমিতি'। সেপ্টেম্বর ১৯৪১-এ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ও স্নেহাংশু আচার্য সম্পাদিত ইংরেজী প্রবন্ধ-সংকলন 'দ্য ল্যান্ড অভ্ সোভিয়েটস্' নামের গ্রন্থের শেষে চুয়াত্তর জনের স্বাক্ষর সংবলিত বিবৃতিতে সুভাষ মুখোপাধ্যায়েরও স্বাক্ষর পাওয়া যায় । '' (ঐ, ১৩২-১৩৩)

এরপর ১৯৪২ সালে, একই সঙ্গে আন্তর্জাতিক পটভূমি, ভারতের জাতীয় রাজনীতির সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের ব্যক্তিজীবনের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ন একটি সময়। এই বছর তার অক্লান্ত পরিশ্রম, পরিকল্পনা ও উদ্যোগে সোমেনচন্দের হত্যাকান্ডের প্রতিবাদে ও তাঁর স্মৃতিতে 'প্রাচীর' নামে কবিতা সংকলন প্রকাশিত হয়েছিল। এতে তাঁর সঙ্গে আর্থিকসহায়তা করেছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী এছাড়া মিহির বসু এবং অজয় দাসগুপ্ত। এই বছর ফ্যাসীবাদী হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমন করলে সারা দুনিয়া এর প্রতিবাদ জানিয়েছিল। ভারতে স্বদেশের ঔপনিবেশিক ব্রিটিশের হাত থেকে মুক্তির জন্য আন্দোলন জোড়দার হয়ে ওঠে। সুভাষ মুখোপাধ্যায় এরই প্রেক্ষিতে ১৯৪২ সালে ভারতের কমিউনিষ্ট পার্টির সদেস্যপদ গ্রহণ করেছিলেন। এই ১৯৪২ সালেই তিনি সোমেনচন্দের হত্যাকান্ডের পর অন্যতম আহ্বায়ক হিসাবে ২৮ শে মার্চ গড়ে তোলেন 'ফ্যাসিষ্ট বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘ'। এই সংঘের সভাপতি ছিলেন অতুল চন্দ্র গুপ্ত এবং যুগ্ম সম্পাদক হয়েছিলেন বিষ্ণু দে ও সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এই সময়কালে রচিত কবিতায় আমরা তাঁর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ আসন্ন পুঁজিবাদী, ফ্যাসীবাদী, কালোবাজারী ও ধনতন্ত্রবিরোধী শিল্পীমানসের পরিচয় পাই। এই সময়ে রচিত তাঁর 'বজ্রকণ্ঠে তোলো আওয়াজ' ভারতের ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী প্রথম গণসঙ্গীত হিসেবে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

এই বছরই সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রকাশ করেছিলেন ফ্যাসিষ্ট বিরোধীতে রচিত কবি বিষ্ণু দে-র কবিতা সংকলন 'বাইশে জুন'। এই বছরের শেষে ডিসেম্বর মাসে তিনি গোলাম কুদ্দুসের সঙ্গে সম্পাদনা করেছিলেন 'একসূত্রে' নামের একটি কবিতা সংকলন। এই সময় কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় কমিউনিষ্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী হিসেবে নিজেকে নিযুক্ত করেছিলেন। সেই সঙ্গেঁ অবিরাম লিখেছিলেন 'পরিচয়', 'অরণি', 'জনযুদ্ধ', 'প্রতিরোধ' প্রভৃতি পত্রিকায়।

এরপর ১৯৪৩ সালে তাঁর ব্যক্তি মানসকে বড় রকমের আঘাতে আলোড়িত করেছিল বাংলার তেরশ পঞ্চাশের মন্বন্তর। এই দুর্ভিক্ষের সত্য তাঁর সাহিত্যসত্য হয়ে উঠেছিল। দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের

হতাশ জীবনে প্রচন্ড আশাবাদিতা জাগানোর জন্য কিশোরকবি সুকান্ত ভট্টাচার্য সম্পাদিত 'আকাল' কবিতা সংকলনটিতে তিনি কবিতা লিখেছিলেন । এই সময়কালের তাঁর কবিতার শিল্পসার্থকতা কবি বুদ্ধদেব বসুর কথায় আমরা পাই — '' নিছক কান দিয়ে শুনলে এ-সব কবিতা ভালো লাগবে ; এদের আগাগোড়াই — এমনকি জাপানি বোমাবর্ষণের বর্ণনাতেও — শোনা যাচ্ছে প্রচ্ছন্ন, কিন্তু স্পষ্ট, একটি আশার — এমনকি বেপরোয়া ফুর্তির — সুর ; এ যেন বৃহৎ জনসভায়, বা 'ছাত্র আর মজুরের উজ্জ্বল মিছিলে' গাইবার মতো রচনা, আর কবির কৃতিত্ব এখানেই যে এত চেঁচিয়ে কথা ব'লেও তাঁর কণ্ঠস্বর বিকৃত হয়নি ; যে-ছন্দ তাঁর কথাগুলোকে দোলাচ্ছে , নষ্ট হয়নি তার সুমিতি। . . . সমসাময়িক অনেক কবির কাছেই তিনি পাঠ নিয়েছেন — বিশেষত বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কাছে — কিন্তু তাঁর লেখা অন্য কারো অক্ষরের উপর মকশো-করা নয় ; এত অল্প বয়সে যে নিজের একটি বিশিষ্ট রীতি তিনি নির্মাণ করতে পেরেছেন, এতেই তাঁর প্রতিভার পরিচয়। '' (কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ্ তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা ৮৫)

১৯৪৩ এর দুর্ভিক্ষের মর্মাহত কবি তাঁর কবিতা ও গদ্য রচনায় ব্যক্তিক অনুভূতি শিল্পে উন্নীত করেছিলেন। এইসময় পার্টির মুখপত্র 'জনযুদ্ধ'-এ যোগদান করে দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলার মাঠ-ঘাট-নদী-বন্দর-কারখানা-গ্রাম-শহর ঘুরে ঘুরে অসংখ্য রিপোর্টাজধর্মী নিবন্ধ রচনা করেছিলেন। এই বছর ১৯৪৩-এর মে মাসে বোম্বাইয়ে পার্টি কংগ্রেসের প্রাক্কালে অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সংঘের সর্বভারতীয় সম্মেলনে বাংলার হয়ে তিনি যোগদান করেছিলেন। রাজনৈতিক কর্মে যুক্ত হয়ে পরার ফলে এই সময় তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম.এ. তে দর্শন শাস্ত্রে শেষ পর্যন্ত চূড়ান্ত পরীক্ষায় বসতে পারেননি। এভাবে তাঁর ছাত্রজীবনের গতানুগতিকতা বৃহৎ জীবনের দর্শনে উন্নীত হয়েছিল ।

রাজনৈতিক জীবনের পাশাপাশি তাঁর সাহিত্যজীবনে এই সময় দুর্ভিক্ষ ও স্বদেশ চেতনা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় রূপে দেখি আমরা। তাঁর 'চিরকুট' ও কিছুকাল পূর্বে রচিত 'পদাতিক' কাব্যের কবিতায় দুর্ভিক্ষ ও দেশপ্রেমের মহৎ জীবনদর্শনের শিল্পরূপ নির্মাণ করেছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর পদাতিক কাব্যের আর্য এবং চিরকুট কাব্যের 'মুখবন্ধ', 'আহ্বান', 'চিরকুট', 'এই আশ্বিনে', 'স্বাগত', 'বর্ষশেষ', 'ঘোষণা', 'স্বাক্ষর', 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে দুর্ভিক্ষে আহত ও বিক্ষত কবিহৃদয়ের আত্মোপলব্ধিজাত শিল্পসৃষ্টির প্রয়াস দেখতে পাই আমরা। মন্বন্তরের পাশাপাশি স্বদেশচেতনা তাঁর চেতনায় এই সময় অত্যন্ত গুরুত্ব পেয়েছিল। তাঁর এই সময়ে রচিত 'চিরকুট' কাব্যের 'স্ফুলিঙ্গ', 'দীক্ষিতের গান', 'জবাব চাই', 'ফের আসবো', 'উনত্রেশ জুলাই', 'ঘোষণা', 'স্বাগত', 'প্রতিরোধ প্রতিজ্ঞা আমার', 'এই আশ্বিনে', 'স্বাক্ষর' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে

দেশমাতার পরাধীনতার শৃঙ্খলবন্ধন থেকে মুক্ত করার দৃঢ়, সংকল্পবদ্ধ, উচ্চকিত ও আশাবাদী কবিকণ্ঠ পাই আমরা।

পৃথিবীর আসন্ন মহাবিশ্বযুদ্ধের মহাসংকটে দাঁড়িয়ে , ফ্যাসীবাদীদের আগ্রাসীনীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর জন্য এবং স্বদেশকে শাসনকারী বিদেশিরাজের টুটি চেপে ধরার শিল্পিত প্রয়াস 'কেন লিখি?' ১৯৪৪ সালে হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে বাংলার বিশিষ্ট সাহিত্যিকগনের জবানীতে রচিত নিবন্ধ সংকলণের সম্পাদনা করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। এতে ৮০জন সাহিত্য অনুরাগীর সাহিত্য সৃষ্টির কেন্দ্রে নিহিত সমকালের সমাজ প্রেক্ষিত 'কেন লিখি?' সংকলণের মুখবন্ধে সমকালের ব্যক্তিমানস ও সাহিত্য রচনার দার্শনিক চেতনা আমরা পাই। সেখানে হিরণকুমার সান্যালের সঙ্গে যৌথভাবে সুভাষ মুখোপাধ্যায় স্বীকৃতি জানান যে সাহিত্যিকের শিল্প-নির্মাণের তাগিদ আসে সমাজ থেকে। এবং এই শিল্পের রূপ যেমন সামাজিক পরিবেশের ছাঁচে ফুটে ওঠে তেমনি এই দুই যুগে যুগে সমধর্মে পরিবর্তন হয় । এই নিবন্ধে তাঁর সমকালের সাহিত্যধর্ম, রাজনীতির আদর্শ ও সমাজভাবনার নিদর্শন পাই আমরা — '' আজকের সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যিকেরা তাঁদের সামাজিক পরিবেশ সমন্ধে যথেষ্ট সচেতন হয়তো নন কিন্তু এই পরিবেশ তাঁদের সাহিত্য নিয়ন্ত্রিত করছে অনিবার্য শক্তিতে। এই শক্তি যাতে প্রগতির শক্তি হয়, যাতে মানুষের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে প্রশস্ততর পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে এই শক্তি সাহায্য করে, তার জন্যে সচেষ্ট হওয়ার দায়িত্ব সাহিত্যিককেও নিতে হবে, সমাজের অন্য সকলের সঙ্গে একযোগে, মজুর, চাষি, উকিল, ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক সকলের সঙ্গে এক অবিচ্ছেদ্য সূত্রে যুক্ত হয়ে।

এর উত্তরে হয়তো অনেক সাহিত্যিকই বলবেন আমরা তো এই ভাবে যুক্ত আছি। গরিবের দু:খে আমরা কাঁদি, অত্যাচারীর বিরুদ্ধে আমরা জেহাদ ঘোষণা করি, সুবিধা পেলেই প্রচার কবি যে আমাদের আদর্শ স্বদেশের স্বাধীনতা অর্জন। ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী সংঘ থেকে আমরা এই জবাব নিশ্চয়ই শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনব কিন্তু তবু বলব, আমরা শুধু এতে সন্তুষ্ট নই। আজ পৃথিবীর ইতিহাসে যে সংকট দেখা দিয়েছে তা অভাবিতপূর্ব। তাই এর প্রতিকারে বদ্ধ পরিকর হতে হলে মামুলি আদর্শের ছাঁচ ছেড়ে সম্পূর্ণ নতুন ছাঁচে আমাদের সমগ্র চিন্তাকে চালাতে হবে। পুরোনো সমাজ-ব্যবস্থার বদলে যে নতুন সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে উঠবার উপক্রম হয়েছে তাঁর চাবিকাঠি তাদের হাতে যারা নিজেদের শারীরিক শ্রম একদিন নিয়োজিত করেছে শুধু পরের দাসত্বে। আজ পৃথিবীব্যাপী সংগ্রাম এদেরই মুক্তি সংগ্রাম। যারা এদের শত্রু তারা আমাদের সকলের শত্রু তাদের বিনাশের জন্যে স্বদেশে ও বিদেশে আমাদের সকলকে এক হতে হবে।'' ('কেন লিখি ?' সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, প্রথম মিত্র ও ঘোষ

সংস্করণ, ২০০০, পৃষ্ঠা 'মুখবন্ধ' অংশ) এই সময়ের কবি হিসেবে তাঁর রচনাকে প্রভাবিত করেছিল সমকালের সমাজপ্রেক্ষিত। সে প্রসঙ্গে ড: জয়গোপাল মন্ডল লিখেছেন —'' পরিবর্তিত সময়ের ছবি কবি সুভাষের কবিতায় সুস্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে। একদিকে শাসন-শোষণ, বঞ্চনা, অত্যাচার, অন্যদিকে শোষিতদের হুঙ্কার। কবি শোষিতদের পক্ষে। একই সঙ্গে বেজে উঠেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের দামামা। ফলে সামগ্রিকভাবে সুন্দর পৃথিবী আবার ভয়ংকর সংকটের মুখোমুখি। এই সময়ের ভারতবর্ষ উঠে এল কবি সুভাষের কবিতায়।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতায় ঘর ও বাহির, ড: জয়গোপাল মন্ডল, পুস্তক বিপণি, ২৭ বেনিয়াটোলা লেন, প্রথম প্রকাশ, ২০০৭, পৃষ্ঠা ১১২)।

এরপর দ্বিতীয় মহাবিশ্বযুদ্ধের অবসান ও ভারতের স্বাধীনতা প্রাপ্তির আগের সময়ে বাংলা ও ভারতে তখন অগ্নিগর্ভ পরিস্থিতি। ১৯৪৬ সালে কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সাংবাদিক হিসাবে কাজে যোগদান করেছিলেন। এই সময়ের বিক্ষুব্ধ জনতার প্রতিরোধ, আন্দোলন ও মুক্তিকামী মানস তাঁর কাব্যে শিল্পরূপ পেয়েছিল। 'স্বাধীনতা' পত্রিকার ১৯৪৬ সালের ১৬ই জানুয়ারী ও ১৭ই জানু: অমলেন্দু সেনগুপ্তের কথায় মাহবুবুল লিখেছেন —''১৯৪৬ সালের শুরু থেকেই বাংলায় সাম্রাজ্যবাদবিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলন ও বিক্ষোভের জোয়ার জেগেছিল। তার সঙ্গে এক স্রোতে মিলেছিল শ্রমিক আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ। সে সময়ে শ্রমিক আন্দোলন দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ছিল শিল্পাঞ্চল থেকে শিল্পাঞ্চলে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ছয় বছরের জমে থাকা বিক্ষোভ যেন হঠাৎ আগ্নেয়গিরির লাভার মতো ফেটে পড়তে থাকে। শ্রমিক বিক্ষোভ বানচাল করতে ব্রিটিশরাজ বেছে নেয় দমননীতির পথ। গোয়ালিয়রের বিড়লা মিলে এবং কলকাতার ব্রেথওয়েট কারখানায় শ্রমিক ধর্মঘটকে কেন্দ্র করে শ্রমিক-জনতার ওপর চলে অবিশ্রান্ত গুলি। এর প্রতিবাদে খিদিরপুরে ধর্মঘটে সামিল হয় হাজার হাজার শ্রমিক।'' (তিনজন আধুনিক কবি — মাহবুবুল হক, নয়া উদ্যোগ, ২০৬ বিধান সরণি, কল — ৬, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ২১৪)

তাঁর ব্যক্তিমানসে বাংলার বিক্ষোভ ও ঔপনিবেশিক শক্তি প্রচন্ড প্রভাব ফেলেছিল। এই প্রতিক্রিয়ায় তিনি 'চিরকুট'কাব্যের 'দীক্ষিতের গান', 'জবাব চাই', 'ফের আসবো', 'ঊনত্রিশ জুলাই', 'ঘোষণা' প্রভৃতি কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন। সমকালের জাতীয় মানস ও ঝঞ্ঝাবিক্ষোভ তাঁর কবিতায় শিল্পরূপ পেয়েছিল — ''রক্তের ধার রক্তে শুধব/ কসম ভাই!/ ব্রেথওয়েটের , গোয়ালিয়রের/ জবাব চাই।/ লাখো লাখো হাত এক হলে বলো/ পরোয়া কাকে?/ আমাদের দাবী কে রোখে? কে রোখে/ লাল ঝাণ্ডাকে?'' (জবাব চাই / চিরকুট)

এরপরের বছর ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্টে এল বহু প্রতীক্ষিত সেই মাহেন্দ্রক্ষণ — ভারতের স্বাধীনতা লাভ। এই সময় ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির বিরোধ চরম রূপ নিয়েছিল। কংগ্রেসের ব্যবসায়ী ধনীক ও পুঁজিবাদী তোষণনীতির সঙ্গে কমিউনিস্টের ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত গতিপ্রকৃতি। সেই বিষয়টি বিদগ্ধ সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তীর কথায় উঠে এসেছে—'' স্বাধীন দেশের ব্যবসায়ী-তোষক স্বরাষ্ট্র নীতিরও তাঁরা তখন সর্বৈব বিরোধী। দেশের রিক্ত মানুষের অর্থনৈতিক মুক্তির দাবিতে তাঁরা ছিলেন অটল। ট্রেড ইউনিয়ন সংগঠনগুলি যথারীতি তাদের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিল। ধর্মঘট, মিছিল—কোনোটাই বন্ধ হয়নি। তেভাগা আন্দোলনের অগ্নিস্ফুলিঙ্গ মাঝে মাঝেই দেখা দিচ্ছিল এখানে ওখানে। কমিউনিস্ট পার্টি ছিল তার সমর্থক, আর জাতীয় সরকারের চেষ্টা ছিল সেই আন্দোলনগুলির দমন। এই ভাবে কিছুকাল চলবার পরই কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল ১৯৪৮-এর ২৭ মার্চ। (আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, সুমিতা চক্রবর্তী, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ, ২০০৫, পৃ: ১৪১) কমিউনিস্ট পার্টির অসংখ্য কর্মী-সমর্থককে সেকালের কংগ্রেস সরকার কারারুদ্ধ করে রাখে। পার্টিকর্মী, বিভিন্ন গণসংগঠন ও পত্র-পত্রিকাকে নিষিদ্ধ করা হয়েছিল। কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীরা সেকালে অনেকেই আত্মগোপন করে গা ঢাকা দিয়েছিল। সেকালে বিভিন্ন গণমাধ্যমের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়েছিল কংগ্রেস। আবার কমিউনিস্ট পার্টির মুখপাত্র 'স্বাধীনতা' বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। এছাড়াও সাধারণ মানুষ, ভিন্ন মতাদর্শের পার্টিকর্মী, বিভিন্ন দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকাকে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। 'অগ্নিকোণ' কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় সাফল্য-ব্যর্থতা প্রভৃতি বিষয় যুক্ত করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জীবন অভিজ্ঞতায় লব্ধ সমাজসত্য, সমাজ মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ প্রভৃতি তাঁর চিরকুট ও অগ্নিকোণ কাব্যের কবিতায় বিষয় করে তুলেছিলেন।

এই পর্বে কেবল কাব্য কবিতাই নয়, সুভাষ মুখোপাধ্যায় এর আগে 'জনযুদ্ধ' এবং 'স্বাধীনতা' পত্রিকার রিপোর্টার হিসেবে গদ্যরচনায় সমাজ সত্যের ছবি নিয়ে গদ্যশিল্পে ক্রমশ: পরিণত হয়ে উঠেছিলেন। এর মধ্যে ১৯৪৪ সালে 'গণনাট্য সংঘ'-এ নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য নাট্যসাহিত্যেও প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। রিপোর্টার সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলার অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে তাদের প্রতিবাদী ও প্রতিরোধমুখী সচেতনতা গড়ে তোলার প্রয়াস চালিয়েছিলেন তাঁর লেখনীতে। ১৯৪২ সালের ১৫ই জুলাই তিনি 'জনযুদ্ধে' প্রকাশ করেছিলেন তাঁর প্রথম গদ্যরচনা — ''জাপানকে রোখা চাই। চীন ভারত ভাই-ভাই।'' এই পত্রিকায় ১৯৪৩ সালের ২৮শে জুলাই বাংলার মানুষকে জ্ঞাত করেছিলেন —''বর্দ্ধমানের ভয়াবহ বন্যায় হাজার হাজার নরনারী বিপন্ন'' শীর্ষক গদ্য রচনায়। এর পরের বছর 'জনযুদ্ধে' লিখেছিলেন তাঁর গদ্যরচনা—''বিক্রমপুরের বুকে সংকটের ছায়া,

জমি ও জাত ব্যবসা হারাইয়া লক্ষ লক্ষ গ্রামবাসী আজ নি:স্ব।'' (১৯৪৪ সালের ১৪ই জুন) এই পত্রিকায় এই বছরের ৮ই নভেম্বর তিনি প্রকাশ করেছিলেন —''বাংলার বিস্মৃত বন্দীরা'' এবং ''কলের কলকাতা'' শীর্ষক গদ্য রচনা। এই গদ্যরচনাগুলির শীর্ষনামেই আমরা তাঁর গদ্যরচনার উদ্দেশ্যমুলকতা উপলব্ধি করতে পারি। সাংবাদিক হিসেবে কাজ করার সঙ্গে তাঁর সাহিত্য জীবনের সম্পর্কের স্বীকৃতি দিয়ে তিনি বলেছেন —''আমি বলেছিলাম কাগজ কীভাবে আমাকে গ্রামশহরের সাধারণ মানুষের কাছে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। সেখানে শুধু যে নন্দনতত্ত্বের মূলসূত্র খুঁজে পেয়েছিলাম তাই নয় — বাংলা ভাষার প্রাণপুরুষেরও সন্ধান পেয়েছিলাম।

পার্টির কাগজে কাজ করার সুবিধে অসুবিধে দুটোই আছে। সবচেয়ে বড় সুবিধে, সাধারণ লোকের কাছে নিজেকে বাইরের মানুষ বলে মনে হয় না। তারাও বিশ্বাস করে নিজেদের মনের কথা খুলে বলে।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ, প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, কল-৭৩, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ৫৪৪) সংবাদ পত্রে কাজ করার সুবাদে তিনি অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তির সংস্পর্শে এসেছিলেন। আবার কাগজের সাংবাদিকতার সূত্রে বিভিন্ন স্থানে ঘুরে ঘুরে বাংলার মানুষের বন্যা-খরা-মহামারি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজের অভিজ্ঞতার ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন —''সেই প্রথম বন্যা দেখলাম। আমি আর সুনীল জানা। আমি গিয়েছি খবর আনতে, সুনীল জানা ফটো তুলতে। সাংবাদিকতায় দুজনেরই প্রথম হাতেখড়ি। সঙ্গে রাস্তা বাতলাবার জন্যে আছেন ডাক্তার শরদীশ রায়।

যেতে হবে আরও মাইল চার-পাঁচ দূরে। একেবারে হানার মুখে। মওকা বুঝে নৌকো জুটেছে অনেক। তিনগুণ চারগুণ ভাড়া। পকেটে আমাদের যা রেস্ত—তাতে শুধু যাওয়াই যায়, ফেরা যায় না।''(দীপঙ্করের দেশে, আমার বাংলা, ঈগল পাবলিশার্স, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা ২৩) আবার তিনি লিখেছেন —''.....পুরু চার বাঁধের কাছে বসে সেই পুরনো দিনটার কথা ভাবতে ভাবতে একমাত্র আস্ত জানা গান 'বাঁধ ভেঙে দাও, বাঁধ ভেঙে দাও, ভা—ঙো' গাইছি, এমন সময় পিঠের ওপর একটা প্রচণ্ড কিল পড়ল। ফিরে তাকিয়ে দেখি বিজন ভট্টাচার্য, সঙ্গে শম্ভু মিত্র।'' (ঐ, পৃষ্ঠা ২৫)

চল্লিশের দশক ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ দশক। এই সময়ের বাংলার সমাজ ও ভারতীয় জাতীয় জীবনের বিভিন্ন অভিঘাত প্রত্যক্ষ করেছিলেন তিনি। তাঁর অনুসন্ধানী দৃষ্টি ও সংবেদনশীল মন ক্রমশঃ ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতায় পুষ্ট হয়ে যায়। তাঁর সাহিত্য জীবনের বিষয়-ভাব-প্রকৃতি-প্রত্যয়-চিত্রকল্প-ভঙ্গিমা ও মানবিকচেতনা জীবনদর্শনের সামগ্রিক ইমেজ নির্মানে উন্নীত হতে থাকে সেই সময়। সেই সময় রচিত হয়েছিল তাঁর 'চিরকুট' কাব্যের কবিতাগুলি।

দ্বিতীয়বার কমিউনিষ্ট পার্টি নিষিদ্ধ হবার সময়ই ১৯৪৮ সালে তাঁর 'আগ্নিকোণ' কাব্যটি ইন্টারন্যাশনাল পাবলিশিং হাউস, কলকাতা ২০ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। আগে রচিত হয়েও প্রকাশের সময় হিসেবে তাঁর তৃতীয় কাব্য 'চিরকুট' প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫০ সালের এপ্রিল মাসে সারস্বত লাইব্রেরী, কলকাতা ৬ থেকে। ১৯৪৮-সালের মার্চ মাসে ভারতের কংগ্রেস সরকার পশ্চিম বঙ্গের কমিউনিস্ট পার্টিকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলে,সেই পার্টির নেতাদের সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জেলে বন্দী হয়েছিলেন। সেই বছরের জুন মাসেই তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল। আবার এই বছরেরই নভেম্বর মাসে আবার তাঁকে বিনা-বিচারের বন্দী হিসেবে দমদম জেলে কারারুদ্ধ করা হয়েছিল।

জেলে বন্দী থাকার অভিজ্ঞতা তাঁর সাহিত্যে অনেকবার আমরা দেখতে পাই। জেল -জীবন, অনশন, অবরোধ, আইনঅমান্য ইত্যাদি প্রসঙ্গ তাঁর প্রবন্ধ, উপন্যাস, রিপোর্টাজ ও কাব্য-কবিতার বিষয় হয়ে উঠেছিল। ব্যক্তিজীবনের অভিজ্ঞতা ও সাহিত্যকে পারস্পরিক সম্পর্কিত বিষয় করে তুলেছিলেন তিনি। অনেক মহৎপ্রাণ ব্যক্তিত্বকে তিনি জেলের ভেতরে ও বাইরে পেয়েছিলেন। ফলে, ভেতরের ও বাইরের বিচিত্র অভিজ্ঞতা তাঁকে এবং তাঁর সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিল। ১৯৪৪সালের ৮ই নভেম্বর জনযুদ্ধ পত্রিকায় তিনি লিখেছিলেন —''আবার দ্বিতীয় দফায় আলীপুর, দমদমের জেলে অনশন শুরু হয়েছে। আটাশটি দিন, আটাশটি রাত্রি উপবাসে। ডা: রাজেন্দ্রপ্রসাদ আর মহাদেব দেশাই এসেছিলেন গান্ধিজীর দূত হিসাবে।...বাংলা কংগ্রেস তার প্রতিনিধি হিসাবে সুভাষ বোস, শরৎ বোস, মুজফ্ফর আহ্মদ ও সোমনাথ লাহিড়ীকে বন্দীদের কাছে পাঠিয়েছে। ২৮ দিনের সুদীর্ঘ উপবাসেও স্বাধীনতার বীর সৈনিকদের শিরদাঁড়া একটু বেঁকেনি। চোখে তাঁদের শাণিত সংকল্প।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্য সংগ্রহ, প্রথম খন্ড, প্রথম প্রকাশ,১৯৯৪ দে'জ পাবলিশিং, পৃষ্ঠা ৬২৪)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দমদম জেলে কমিউনিস্ট বন্দীদের সাড়া জাগানো অনশন আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। এরপর তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল ভুটানের বক্সা জেলে। সেই জেলের সঙ্গী হিসেবে তিনি অনেক গুণীজনের সান্নিধ্য অর্জন করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী আব্দুর রেজ্জাক খান,'অগ্নিদিনের কথা'র সতীশ পাকড়াশী, উর্দূকবি পারভেজ শহীদী, সমর গুপ্ত, চারু মজুমদার, গিরিজা মুখার্জী, চিন্মোহন সেহানবীশ প্রমুখ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় দীর্ঘকাল জেলে বন্দী ছিলেন। জেলের ভেতরের একটা আলদা জগৎ তাঁর অনুভুতিতে ধরা দিয়েছে —''জেলখানা একটা আলাদা জগৎ। চোর-ডাকাত-খুনী-গাঁটকাটা—এই নিয়ে উচুঁ-পাঁচিল-তোলা এখানকার জীবন। আলো-হাওয়ার সঙ্গে আড়ি। আজব এখানকার ভাষা — না বাংলা, না-হিন্দী। তেমনি ছিরি এখানকার জীবনের।'' (ঐ, পৃষ্ঠা ৭৫)

তিনি জেলে থাকাকালীন প্রত্যক্ষ করেছিলেন কয়েদী দুরস্ত করার হাজার ব্যবস্থা — ডিগ্রিবন্ধ, মার্কাকাটা, কম্বল ধোলাই, মাড়ভাত ইত্যাদি। সেখানকার ছোট্ট ছোট্ট নির্জন কুঠুরিকে বলে ডিগ্রি, বছরে তিনমাস সাজা মাপকরার নিয়ম সেখানে আছে-তাকে বলে মার্কা, সেখানে জেল কর্তাদের মন যোগাতে না পারলে হয় মার্কাকাটা, সেখানে কম্বল দিয়ে কয়েদীর সর্বাঙ্গ মুড়িয়ে লাঠি পেটা করার —প্রচলনকে বলা হয় কম্বল ধোলাই। জেলখানার ভেতরের জীবনকে তাঁর মনে হয়েছিল 'মধ্যযুগের একটা প্রকাণ্ড কারখানা।' জেলের ভেতরে কয়েদীদের হাড়ি-মেথরের কাজ থেকে দাড়িচাল্লি, ধোবিচাল্লি, ঘানিঘর, মিস্ত্রিঘর, ছাপাখানা, তরকারি বাগান ইত্যাদি প্রকারের সব কাজই করতে হতো। তিনি জেলখানার ভেতরেও প্রত্যক্ষ করেছিলেন শ্রেনীবৈষম্যহীন এক জীবন — ''এরা ছাড়াও জেলখানায় একদল অভিজাত শ্রেণীর কয়েদী আছে। .....ছোটলোক নয় এরা। ইস্কুল-কলেজে পড়েছে। পেটেও টান পড়েনি কোনদিন। এমন নরম মন যে রক্ত দেখলে মূর্ছা যায়। তাই হাজার মানুষকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিয়েও, শত সহস্র ছাঁ-পোষা সংসারকে পথের ফকির করে দিয়েও জেলে গিয়ে তারা সুখে আছে। কেননা তাদের বড় ঘর, বনেদি বংশ —তারা সুয়োরানীর ছেলে। আর যারা পেটের জ্বালায় পথ চলতি লোকের পকেট মেরেছে কিংবা জমি হরিয়ে পাইক-বরকন্দাজদের সঙ্গে লাঠালাঠি করেছে তাদের জন্যে অনন্ত নরকবাসের ব্যবস্থা। কেননা তারা গরিব, সাধারণ মানুষ—।'' (ঐ, পৃষ্ঠা ৭৬)

তাঁর জেলজীবনে বক্সা জেলকে মনে হয়েছিল 'হিটলার-জার্মেনীর কনসেনট্রেশন ক্যাম্প'। তাই তাঁর উপলব্ধি হয়েছিল যে, 'জেলখানা না দেখলে দেশের একটা বড় দিক অদেখা থেকে যায়।' জেলে তিনি বিভিন্ন পেশার, বিভিন্ন প্রকৃতির অসংখ্য জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতায় নিজেকে সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। টানা দুবছর জেলে থেকে তিনি ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে মুক্তি পেয়েছিলেন।

১৯৫০ সাল থেকেই তাঁর সৃষ্ট সাহিত্য তাৎক্ষনিকের বন্ধন কাটিয়ে যুগ-সংকট ও শিল্প-সৃষ্টির পরস্পর-সাপেক্ষতা স্বীকৃতি পেতে থাকে। এ সম্পর্কে সমালোচক সুমিতা চক্রবর্তী লিখেছেন ''মোটের উপর এই হল ১৯৫০ পর্যন্ত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা-লেখার ইতিহাস এবং সাম্যবাদী দল ও মতের সঙ্গে তাঁর সংলগ্নতা। এরপর থেকেই কিন্তু তাঁর সৃষ্টি ধারায় লক্ষণীয় বাঁক-বদল ঘটেছে। তারও মূলে আছে কমিউনিস্ট পার্টির তৎকালীন পরিস্থিতি এবং সমগ্র দেশের আবহাওয়া।

এতকাল পর্যন্ত ভারতীয় কমিউনিস্টদের কাছে সোভিয়েট রাশিয়াই ছিল সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লব ও রাষ্ট্রের আদর্শ। ১৯৪৮ সাল থেকে চীনের সমাজতন্ত্রবাদী বিপ্লবের সাফল্যও তাঁদের সামনে উজ্জ্বল হয়ে

উঠল। রুশপন্থী ও চীনপন্থী দুটি মতবাদ ও গোষ্ঠী এই সময় থেকেই জন্ম নিতে থাকে।'' (আধুনিক বাংলা কবিতার দ্বিতীয় পর্যায়, দ্বিতীয় পরিবর্ধিত প্রজ্ঞাবিকাশ সংস্করণ, ২০০৫, পৃষ্ঠা ১৪৩) সেই সময় থেকে পশ্চিমবঙ্গের সাম্যবাদী গোষ্ঠীর স্বীকৃত মূলনীতি থেকে আলাদা হতে থাকেন সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটা বড় অংশ। এঁদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়, গোপাল হালদার, নীরেন্দ্রনাথ রায়, সুধী প্রধান, নরহরি কবিরাজ, মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়, শান্তি বসু, রাম বসু প্রমুখ।

এরপর জেল থেকে বেরিয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে অসম্ভব আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হয়েছিলেন। জেল থেকে বেরিয়ে দেখেন বাবা চাকুরী থেকে অবসর নিয়েছেন। এরমধ্যে তাঁর মা যামিনী দেবী ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন এবং তাঁর দাদা টাইফয়েডে অকালে আকস্মিক মৃত্যুবরণ করেছিলেন। পারিবারিক একটা বিপর্যয়ের বেসামাল অবস্থা কাটিয়ে তোলার জন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেসময় বুক ওয়ার্লড প্রকাশনার সম্পাদনার ভার নিয়েছিলেন মাত্র পঁচাত্তুর টাকা মাইনেতে। অল্পকালের মধ্যে তিনি সেই প্রকাশনার কাজ ছেড়ে দিয়েছিলেন। এরপর সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৫১ সালে পরিচয় পত্রিকার সম্পাদনার কাজে যোগ দিয়েছিলেন।

এই বছরেই ১৭ই আগস্ট গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়েছিল। সেই বিয়ের স্মৃতিকথায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় দেশ পত্রিকার 'চিঠির দর্পণে' বিভাগে লিখেছিলেন —''বিয়ে বলতে কোন অনুষ্ঠান নয়, রেজিষ্ট্রি। তখন সবে একটা নতুন প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান 'বুক ওয়ার্লড'-এ এডিটর হিসাবে হাফ চাকরী পেয়েছি। ৭৫ টাকা মাইনে। ধুতির ওপর বন্ধু রমাকৃষ্ণর কাছ থেকে ধার করা একটা ডোরাকাটা সার্ট চড়িয়ে বিকেলে ছুটির পর হাঁটতে হাঁটতে সোজা চলে গিয়েছিলাম রেজিষ্ট্রি আপিসে। সে রাত্রে বাড়ি ফিরিনি । ইউরোপ থেকে গীতা সদ্য দেশে ফিরে চৌরঙ্গীটেরাসে কুড়ি টাকায় চারতলায় একটা সিঁড়ির ঘর ভাড়া নিয়েছিল।'' (দেশ, ১৬ই আগস্ট ১৯৮৬, চিঠির দর্পণে, পৃষ্ঠা ১৫-১৬) ।

এতটাই আর্থিক কষ্টে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বিয়ে করেছিলেন যে, বিয়েতে বসার পোশাকটুকু নিজে কিনে নেবার সামর্থ্য ছিল না তাঁর। বন্ধু রমাকৃষ্ণ মৈত্রের কাছ থেকে ডোরাকাটা একটা শার্ট, দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের কাছ থেকে জলচুড়ি পাড়ের একটা ধুতি এবং কবি অরুণ মিত্রের কাছ থেকে বিয়ের পাঞ্জাবী ধার করে বিয়েতে বসেছিলেন তিনি — ''হাসতে হাসতে সেদিন সুভাষ নিমন্ত্রণ করে গেল। যাবার সময় বলল, বিয়ে করবার পাঞ্জাবী নেই। সারাদিন শার্ট পরে থাকে, কোনওদিন পাঞ্জাবী পরেই নি। কেনার মতো আর্থিক পরিস্থিতিও নেই। কারণ রোজগার বলতে কিছু ছিল না। পার্টির হোলটাইমার। সেই আমলে হোলটাইমার হিসেবে অতি সামান্য কিছু পয়সা পেতো তাতেই সংসার

পাতছে। সেই অবস্থায় আমারই একটা লম্বা পাঞ্জাবী দেওয়া হলো। তাই পরে সুভাষ বিয়ে করতে গেল। রেজিস্ট্রি বিয়ে। আমরা গেলাম। যতদূর মনে পড়ে দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, রমাকৃষ্ণ মৈত্র, চিন্মোহন সেহানবীশ এসেছিলেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ও সম্ভবত।'' (কবি অরুণ মিত্র, পত্রপুট, ৩৩ সংখ্যা ১৪০২ বঙ্গাব্দ, পৃষ্ঠা ৫৬)

দারিদ্রকে সহজভাবে গ্রহণ করে জীবনযুদ্ধে জীবনের ইপ্সিত লক্ষে পৌছানোর উদার মন ছিল তাঁর। দারিদ্র কোনদিন তাঁর জীবনের চেমান গতিকে স্তিমিত করতে পারেনি। বরং সেই লড়াইয়ের ভেতর থেকে উত্থিত হয়েছিল তাঁর সৃষ্টিশীল সত্তা। অন্যতম শ্রেষ্ঠ 'ছাপ' কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব কবির ব্যক্তি জীবনের বিশিষ্ট পর্যায়ের স্মৃতির বাহক হিসেবে। কবির জীবনের এই ইতিহাস ধরা পড়েছে কবির আত্মজৈবনিক স্মৃতিকথায়। কবি লিখেছেন — ''জেল থেকে বেরিয়ে সবে দুপুরে আধবেলার একটা নড়বড়ে চাকরি জুটিয়েছি। এক প্রকাশক প্রতিষ্ঠানে। বিকেলে বিয়ে। দুপুরে আপিস। রেজিস্ট্রি বিয়ে। তার আবার পাঁজি দেখাদেখি কী? না দেখার ফল হল এই যে, বিয়ের রাত পোহাতে না পোহাতেই চাকরিটা নট হয়ে গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত তা যাক্ বিয়েটা তো বেঁচে গেছে। আমি যে বিয়ের জন্য বন্ধু রমাকৃষ্ণর কাছ থেকে ডোরাকাটা একটা শার্ট আর দেবীপ্রসাদের কাছ থেকে জলচুড়ি পাড়ের ধুতি ধার করে পরেছিলাম, তার কারণ বিয়েতে আমার মাথার ওপর এমন কেউ ছিল না যে আমাকে বলতে পারে —'বাবা একটা পাঞ্জাবি যোগাড় করতে পারো কি?'. . . . .যাই হোক, ভালোয় ভালোয় সইসাবুদগুলোও হয়ে গেল। বন্ধুরা কেউ ফুল এনেছিল, কেউ মিষ্টি এনেছিল। দল বেঁধে কমলালয়ে গিয়ে চা খাওয়ার পর হৈ হৈ করে ঘরে ফেরা। ঘর বলতে চিলেকোঠা। চারতলায় একটা চিঁড়ে চ্যাপ্টা পায়রার খোপ। পেছনে এক চিলতে চাঁদ সোহাগী ছাদ। তার এককোণে লোহার বীমে চড়ানো জলের ট্যাঙ্কি। সেদিন রাত্রে ঐ ছাদে বসেই গীতার বোন আবু দরাজ গলায় গেয়েছিল: 'প্রেমের জোয়ারে ভাসাব দোহারে .....।'...সে রাত্তিরটা স্মরণীয় হয়ে আছে একটা সম্পূর্ণ অন্য কারণে। ছোট্ট জুনকে চৌকি। দু'জনের পাশ ফেরারও জায়গা নেই। শুয়ে পড়েই যেভাবে ঘুমে ঢলে পড়েছিলাম, তাতে পাশ ফেরার বিশেষ দরকারও হয়নি। মাঝরাতে সিঁড়িতে ভারি বুটের শব্দ। ঘুমের মধ্যে ছ্যাঁত্ করে উঠল। পুলিশ! তার মানে আবার ধরে নিয়ে যাবে। কান খাড়া করে আছি। তেতলায় একটু থেমে এবার চারতলায় উঠছে। নিঃশ্বাস বন্ধ করে আছি। দরজায় কড়া নাড়ার আওয়াজ। আত্মসমর্পণ ছাড়া কীই বা করার আছে? উঠে দরজা খুললাম। টেলিগ্রাম। সে কি? পুলিশ নয়? চক্ষু কর্ণের বিবাদ ঘোচাতে একটু সময় লাগল। বার্লিন থেকে গীতাকে বিয়ের অভিনন্দন জানিয়ে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছেন আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক নারী ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদিকা 'মারি ক্লোদ'। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল আমার।'' (সুভাষ

মুখোপাধ্যায়: জীবন ও সাহিত্য, সম্পাদনা সন্দীপ দত্ত, র‍্যাডিক্যাল ইম্প্রেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০২ পৃষ্ঠা ২৭)

বন্ধু-বান্ধবের কাছ থেকে ধার করা ধুতি-পাঞ্জাবি নিয়ে অনাড়ম্বর বিয়ে এবং সংসার জীবনে পদার্পণের ছবি ও স্মৃতি 'ছাপ' কবিতার বিষয়। কবি লেখেন —

''কেউ দেয়নি কো উলু
কেউ বাজায়নি শাঁখ,
কিছু মুখ কিছু ফুল
দিয়েছিল পিছু ডাক।
পরনে ছিল না চেলি
গলায় দোলেনি হার ;
মাটিতে রঙিন আশা
পেতেছিল সংসার ।'' (ছাপ / যত দূরেই যাই)

বিয়ের আনন্দের সঙ্গে পুলিশী নির্যাতনের আশঙ্কা তার বুকে ঢেউ তুলেছিল। সেই ঝড়-ঝঞ্ঝার বেদনাতুর জলছবি কবিতার ছবি হয়ে ফুটে ওঠে। কবি লিখেছেন — ''হঠাৎ যে কোথা থেকে / ছুটে এসেছিল ঝড় ; / ঢেউয়ের চুড়ায় উঠে / দুলে উঠেছিল ঘর। / জীবনের হ্রদে স্মৃতি / চোখ বুজে দিল ঝাঁপ; / ভিজিয়ে সে-জলছবি / তুলে নিল এই ছাপ।''

মানব সভ্যতার অন্ধকারে ডুব দিয়ে কবি প্রত্যক্ষ করেছেন একটু একটু করে কিভাবে মানুষ আলো থেকে অন্ধকার জগতে ডুবে যায়। কিভাবে মানুষ 'ঘাড় হেঁট করে' ''সংসারের ভাব দ্বন্দ্ব ভালো মন্দ ইত্যাকার নানান বিষয়ে / ভাবনায় নিগুঢ় হয়ে '' ক্রমশ নিজেকে নরকে নিমজ্জিত করে, সেই উপলব্ধি তাঁর শিল্পিত রূপে ফুটে উঠেছে।

১৯৫১ সালেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর প্রথম গদ্যগ্রন্থ 'আমার বাংলা'। এই বছরেই তাঁর সঙ্গে কবি নাজিম হিকমতের কবিতার পরিচয় হয় — ''এভাবে '৫১ সালে পৌঁছে 'পরিচয়' সম্পাদনার দায়িত্ব এল আমার উপর। টাকার টানাটানি চলেছে। এমন সময় একদিন ডেভিড কোহেম নামে একজন ইহুদি, তিনি পার্টি মেম্বার ছিলেন, তাঁদের একটা কাগজ ছিল, সেখানে কেউ আমেরিকা থেকে ইংরাজি অনুবাদে সাইক্লোস্টাইল করা নাজিম হিকমতের কবিতা পাঠিয়েছিল। 'পরিচয়ে'র জন্য সেটা আমাকে পাঠানো হয়। আমি ফরাসিতে অনুবাদ করা একটা কপিও পেলাম। এই দুটো মিলিয়ে হিকমত

অনুবাদ করলাম। আমার ভাবনা চিন্তার ক্ষেত্রে নাজিম হিকমত বড় রকমের ঘটনা এটা সন্দেহ নেই।'' (অদ্রীশ বিশ্বাসের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি, ঐ, পৃষ্ঠা ৪১-৪২)

১৯৫২ সালে সুভাষ মুখোপাধ্যায় শ্রমিক সংগঠনের কাজে সস্ত্রীক গিয়েছিলেন বজবজ। সেখানে তিনি শিল্পাঞ্চলের শ্রমিক জীবনের বাস্তব অবস্থার সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন —''দেশের লোক চুলোয় যাক, বজবজের লোকেরাই বা তাদের কাছ থেকে কী পেয়েছে? পেয়েছে শুধু ধোঁয়াধূলো আর রোগব্যাধি। ইস্কুল না, কলেজ না, ক্লাব না, হাসপাতাল না। কিছু আত্মসুখী বড়লোক আর কিছু দালাল। নতুন কোনো শিল্প না, গবেষণাগার না, কারিগরি বিদ্যালয় না।'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গদ্যসংগ্রহ প্রথম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৪ পৃষ্ঠা ৪৬৯)

এই শ্রমিক সংগঠনের কাজে যুক্ত থাকার সঙ্গে তাঁর সৃষ্টির যোগ অসামান্য — ''শ্রমিকদের জীবন ও সংস্কৃতির সঙ্গে এখানেই সুভাষের বাস্তব ও গভীর পরিচয় ঘটে। এই অভিজ্ঞতা তাঁর নন্দন-চিন্তার ক্ষেত্রেও আমুল পালাবদল সূচিত করে। শ্রমিক শ্রেণীর দর্শনের প্রতি আনুগত্য ও বিপ্লবী মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে যেমন শ্রমিক আন্দোলনে সক্রিয় অংশগ্রহণের প্রেরণা যুগিয়েছে তেমনি রচনা করেছে তাঁর এই পর্বের কবিতার মৌল ভিত্তি।'' (তিনজন আধুনিক কবি সমর সেন সুভাষ মুখোপাধ্যায় সুকান্ত ভট্টাচার্য ; মাহবুবুল হক, নয়া উদ্যোগ, প্রথম প্রকাশ, ২০০৫ পৃষ্ঠা ১৭৫)

১৯৫২ সালের বজবজের শ্রমিক সংগঠনের কথায় তাঁর স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — ''সত্যিই তো, দেশ জানি না, মানুষ চিনি না—কেবল ঝুড়ি ঝুড়ি কথা! তাই একদিন, ১৯৫২সালের এক ভোরবেলায় শ্বশুরমশাইয়ের চোখের জলের মধ্যে দিয়ে, 'ফিরে চল মাটির টানে' বলে একটা ধড়্ধড়ে ট্রাকে কিছু নড়বড়ে তক্তোপোষটোস নিয়ে যখন উঠলাম গিয়ে বজবজের ব্যাঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের এঁদো পুকুরের ধারে এক মুসলমানের কুঁড়ে বাড়িতে,.....'' (সুভাষ মুখোপাধ্যায় কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ পৃষ্ঠা ৭৯) ব্যাঞ্জনহেড়িয়া গ্রামের সেই শ্রমিক জীবন তাঁদের বিস্মিত করে তুলেছিল সেদিন। তাঁরা স্বামী-স্ত্রী শ্রমিকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিলেন —''চটকলের মেয়েদের মধ্যে বহু হিন্দু মেয়ের কাছাকাছি এসে অবাক হয়েছিলেন তাদের বেঁচে থাকার ক্ষমতা দেখে। বিধবা, স্বামী-পরিত্যক্তা, গৃহছাড়া আইবুড়ো মেয়ে, ধর্ষিতা—সব চটকলে, নামমাত্র মজুরিতে বেঁচে আছে। কিন্তু নানা রঙ আছে তাদের মনে। একবার অরুণা আসফ আলি আসবেন সুভাষ-ময়দানে। সে কী উত্তেজনা! ছোটো ছোটো মিছিল, বড়ো বড়ো ফেস্টুন হাতে মেয়েরা সময়ের আগে চলে গেছে সভায়।'' (গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ঐ, পৃষ্ঠা ৮০)

ব্যাঞ্জনহেড়িয়া গ্রমের কুঁড়ে গরে সেদিন তাঁদের কাছে গিয়েছিলেন চিন্মোহন সেহানবীশ, কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়ার সাধারণ সম্পাদক অজয় ঘোষ প্রমুখ ব্যক্তিত্ব। সেই সময় সস্ত্রীক সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘনিষ্টতা বেড়েছিল সাহিত্যিক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। এই বছরই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর অনুবাদ গ্রন্থ ' নাজিম হিকমতের কবিতা ' এবং শিশুকিশোরদের গ্রন্থ 'বাঙালীর ইতিহাস'।

বজবজের শ্রমিক সমাজে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও তাঁর স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত প্রিয়জন হয়ে উঠেছিলেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে আমৃত্যু ভালোবেসে গিয়েছিল সেই শ্রমজীবী মানুষগুলি — ''সুভাষদা এবার যখন পি. জি. হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে ভর্তি, সেই সময়ে বজবজের কয়েকজন শ্রমিক এবং তাদের পরিবারের লোকেরা পি. জি. হাসপাতালে এসেছিলেন সুভাষদাকে দেখতে। এদের মধ্যে বাবর আলি, সোলেমান, আহম্মদের সন্তান সন্ততিও ছিল।'' (দিলীপ চক্রবর্তী, সপ্তাহ পত্রিকা, ৮ই আগস্ট ২০০৩, পৃষ্ঠা ১০)

বজবজে সংগঠনের কাজে থাকলেও পার্টির কাজ থেকে কোনোরূপ ভাতা নেন নি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। শত অভাবের মধ্যে মাত্র কুড়ি টাকায় একটি মাটির দেয়ালের ঘরে ভাড়ায় থেকে তিনি পরিচয়-এর সম্পাদনা, সংগঠনের কাজ ও লেখার কাজে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছিলেন। লেখায় সমান্য রোজগারে দিনাতিপাত করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। শ্রমিক ও মজুরদের মধ্যে নিমগ্ন থেকে রচনা করেছিলেন 'ভূতের বেগার' গ্রন্থটি। কার্ল মার্ক্সের 'ওয়েজ লেবার এন্ড ক্যাপিটাল' অবলম্বনে অর্থনীতি বিষয়ক 'ভুতের বেগার' গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছিল ১৯৫৪ সালে। ১৯৫৩ সালে তাঁর অনূদিত গদ্য গ্রন্থ 'কত ক্ষুধা' ভবানী ভট্টাচার্যের So many Hungers অবলম্বনে প্রকাশিত হয়েছিল। ক্ষুধা ও দারিদ্র তাঁর পথ চলাকে থামিয়ে রাখতে পারেনি। এরপর ধারাবাহিক লিখে তিনি ১৯৫৪ সালের জুন মাসে 'রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ' এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রকাশ করেছিলেন তাঁর 'অক্ষরে অক্ষরে' শিশু-কিশোরদের গদ্য গ্রন্থটি। তিনি ১৯৫৪ সালেই পশ্চিমবঙ্গের বিশিষ্ট সাহিত্যিকগণের সঙ্গে ঢাকায় অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই বছরই তিনি বজবজের চটকল থেকে আবার কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন।

কলকাতায় ফিরে এসে তিনি পিতা হয়েছিলেন। সে সময় তাঁর বড় মেয়ে 'পুপে' ঘর আলো করে এসেছিলো। সেই সময় সত্যজিৎ রায়ের 'সন্দেশ' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে তাঁর সাহিত্যের পরিধি গভীরতা ও বিস্তৃতি পেয়েছিল। সেই সময়ের স্মৃতিকথায় তাঁর স্ত্রী গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় লিখেছেন — ''আমি পেটের দায়ে চাকরির সন্ধানে প্রশান্তকুমার মহলানবীশের দ্বারস্থ হলাম। রোজ সকাল-বিকেল বরাহনগর যাওয়া আর সাদার্ন অ্যাভেনিউতে সন্ধ্যেবেলা ন'নম্বর বাস থেকে নামা। তার মধ্যে অবশ্য

'সন্দেশ' আপিসে হানা দেওয়া, নাটকের রিহার্সাল, মেয়ে পুপেকে নিয়ে আদিখ্যেতা—আপিসের কাগজে 'ববির বন্ধু' লেখা, সবই চলছে।

'সন্দেশ'আপিস তখন ধর্মতলায় রমরম করে চলছে। সত্যজিৎ আর সুভাষের হাসি হাসি মুখে ডাঁই ডাঁই লেখা ফেরৎ দেওয়ার ব্যাপারটা তখন নব্য আর নামকরা লেখকদের মধ্যে 'অমায়িক-ইয়ে' নাম কিনেছে।'' (গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ; সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কথা ও কবিতা, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৮ পৃষ্ঠা ৮২) এবছরই প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর 'কথার কথা', 'জগদীশচন্দ্র বসু', ছোটদের জন্য সঙ্কলিত তাঁর 'পাতাবাহার' ইত্যাদি গ্রন্থ।

১৯৫১ সাল থেকে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ জীবন অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ শিল্পীসত্তা থেকে তিনি লিখেছিলেন 'ফুল ফুটুক' কাব্যগ্রন্থটি। এই সময়কালে তিনি তাঁর রাজনৈতিক জীবনে ও কর্মজীবনে শ্রমিক সংগঠনের কাজ করেছিলেন। তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের সঙ্গে পরিচয়। এই ঘটনাগুলি তাঁর জীবন ও সাহিত্যে বড় বাঁক নিয়েছিল। তিনি একেবারে নিম্নবর্গের মানুষের সঙ্গে একাত্ম হয়ে কাজ করে সঞ্চয় করেছিলেন ভাষা ও শিল্পের নির্মাণ দক্ষতা। তাঁর সাহিত্যের গড়ন ক্রমশ: পরিবর্তিত হতে থাকে। তিনি কবিতায় নিয়ে আসেন আটপৌরে ভাষা এবং প্রকাশ আঙ্গিকে আনেন কথন ভঙ্গিমা। কবিতায় আগাগোড়া যুক্ত হয়েছিল দৃঢ় প্রত্যয় ও পৃথিবীকে নিজের মত করে বদলানোর স্বপ্ন। এই সময় তাঁর সাহিত্যে আসে মহৎ মানবিক আবেদন। এই সময়ের 'ফুল ফুটুক' কাব্য সম্পর্কে সাহিত্য সমালোচক অশ্রুকুমার সিকদার লিখেছেন —''গোঁড়া রাজনীতিতে বিশ্বাস যখন শিথিল হয়ে এলো তখন ভস্মস্তুপের ভিতর থেকে পুরাণ-পাখির মতো জন্মালো মানবতাবাদে গভীর প্রত্যয়। 'ফুল ফুটুক' কবিতাপর্যায় সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিজীবনের ইতিহাসে মানবতাবাদের উজ্জীবনের কাব্য।'' (আধুনিক কবিতার দিগ্‌বলয়, অরুণা প্রকাশনী, প্রথম সংস্করণ, ষষ্ঠ মুদ্রণ, ১৪০৬ পৃষ্ঠা ২৫৫) এই সময়ের কাব্য প্রত্যয় ও বিষয় সম্পর্কে অধ্যাপক ফাল্গুনী ভট্টাচার্য ও ড: আদিত্য মুখোপাধ্যায় আলোকপাত করেছেন —''নিম্ন মধ্যবিত্ত ও মধ্যবিত্ত ছাপোষা জীবন, লড়াকু সৈনিক, দলিত মানুষ, কেরাণী, মিছিলের মানুষ, সালেমনের মা, কারখানার শ্রমিক, নি:স্ব চাষীদের নি:স্ব রিক্ত বিবর্ণ জীবনযাপণ তাঁর কবিতায়, দরদী ছোঁয়ায় ফুটে উঠেছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের সমাজচেতনার কেন্দ্রে রয়েছে সাম্যবাদ — এবং তার নিউক্লিয়াসটি হল মানব তন্ময়তা। মানুষকে ভালোবাসেন বলেই তাঁর দেশপ্রেমে মানবপ্রেমে অনুপম সংমিশ্রণ।''(একালের কবিতা: প্রকৃতি ও প্রবণতা, পাণ্ডুলিপি, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০০৯ পৃষ্ঠা ১৫৪) এই কাব্য প্রকাশের বছরেই প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর ছোটোদের জন্য রচিত 'দেশ-বিদেশের রূপকথা' এবং 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কবিতা' গ্রন্থটি। এরপরের বছর ১৯৫৮

সালে তিনি তাসখন্দে অনুষ্ঠিত 'অ্যাফ্রো-এশিয়ান লেখক সম্মেলন'-এ ভারতের লেখকদের হয়ে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। সেই সম্মেলনে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হয়েছিল তুরস্কের কবি নাজিম হিকমতের সঙ্গে।

ঊনিশশ ষাটের দশকের প্রথম দিকে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দেখা দিয়েছল প্রচন্ড অর্ন্তদ্বন্দ্ব, পার্টির বিরুদ্ধে অপপ্রচার, কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বের অদূরদর্শিতা এবং শ্রমিক-কৃষক গণ আন্দোলনের প্রচন্ড শিথিলতা। এই বিপর্যয়ের সময়েও ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিজের প্রত্যয় ও সাম্যবাদে অটল ছিলেন। ১৯৬০ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত বিশ্বের ৮১টি পার্টির বিশ্বসম্মেলনে শান্তি প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল। ভারতেও সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোয় 'জাতীয় গণতান্ত্রিক বিপ্লব' নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল। ভারতের তৎকালীন সি.পি.আই পার্টি এই নীতি সমর্থন করেছিল। বামপন্থী দলের মধ্যে মতপার্থক্য দেখা দিলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতেই থেকে যান। এই রাজনৈতিক কোন্দল, দ্বিধা, সংশয় উত্তীর্ণ হয়ে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনেএর সংকীর্ন বৃত্তের বাইরে এসে সাহিত্যচর্চার মধ্য দিয়ে পৃথিবীকে নতুন করে গড়ার স্বপ্ন-প্রত্যয় নির্মাণ করেছিলেন। নবজীবন বোধে তিনি রাজনৈতিক সংকটের উর্ধ্বে আত্মস্থ হয়েছিলেন মানবিক চেতনায়। তিনি সমাজের মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে জনচেতনায় উদ্দীপিত হয়ে সৃষ্টির ও শান্তির এক নির্মল জগৎ গড়ার অঙ্গীকারে দৃঢ়পিনদ্ধ থেকেছিলেন। এই মানস চেতনার প্রতিফলন দেখি আমরা তাঁর 'যত দূরেই যাই' (১৯৬২) কাব্যগ্রন্থটিতে। এই কাব্যগ্রন্থটির জন্য তিনি ১৯৬৪ সালে তিনি 'সহিত্য একাদেমী পুরস্কার'-এ সম্মানিত হয়েছিলেন। ইতিমধ্যে তিনি সৃষ্টি করেছিলেন — 'রুশ গল্প সঞ্চয়ন'(১৯৬৩), 'ব্যাঘ্রকেতন' (১৯৬০) এবং 'দিন আসবে' (১৯৬১—বুলগেরিয়ান কবি নিকোলো ভাপৎসায়ঙের কবিতার অনুবাদ)। এই বছরেই অর্থাৎ ১৯৬৪ সালে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যায়। এই সময় পার্টির ভাঙন সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে মোচড় দিয়ে আঘাত করেছিল। এর প্রভাবে তাঁর 'কাল মধুমাস' (১৯৬৬) কাব্যগ্রন্থে কবি মানসে আমরা দেখি বিপন্ন সময়ের বেদনাবিধুরতা ও বিষন্নতা। কবি এই সময় হৃদয়ের সেই ক্ষত ঢাকতে আশ্রয় নিয়েছিলেন চল্লিশের দশকের সংগ্রমমুখর আন্দোলনের নস্টালজিক স্মৃতিরোমন্থনে। কবি মহাকালের গতিতে উত্থিত সেই ট্র্যাজিক পরিণতির অবসানে এক স্বপ্নময় জীবনের আশা হৃদয়ে জাগিয়ে রেখেছিলেন। তাঁর সৃজনীসত্তায় কালের সংকট থেকে উত্তরণের আশ্রয়স্থল হয়ে উঠেছিল প্রকৃতি ও জীবন। এবং যুদ্ধের ভয়াবহ অগ্নিগর্ভ থেকে শান্তি প্রস্তাব হবে বলে গভীর প্রত্যয় রেখেছিলেন মনে। তাঁর হৃদয়ে সেই সময় যদ্ধকে কেন্দ্র করে দেশপ্রেম কাব্যশিল্পে রসোত্তীর্ন হয়ে উঠেছিল।

এই সময় সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৬৬'র বাংলার খাদ্য আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন। সেই সময় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেনের বাংলাদেশের ভয়ঙ্কর খাদ্যসংকট বাংলার সাধারণ মানুষের জীবন ও অস্তিত্ব তখন সংকটের সম্মুখীন। সারা বাংলা তখন ধর্মঘট, বিক্ষোভ, অবস্থান, গ্রেফতার ও গুলিবারুদে উত্তপ্ত ১৯৬৬ সালের ১০ই মার্চ বামফ্রন্ট সারাবাংলা ধর্মঘটের ডাক দিয়েছিল। সেই সময়ের কথায় জ্যোতিপ্রকাশ চট্টোপাধ্যায় লিখেছিলেন —''ছেষট্টির ফেব্রুয়ারীতে বসিরহাটে প্রথম ঘটে মানুষের ক্ষোভের বিস্ফোরণ। পুলিশের গুলিতে মারা যায় কিশোর ছাত্র তেঁতুলিয়ার নুরুল ইসলাম। সে বিস্ফোরণের আগুন ছড়িয়ে পড়ে সারা পশ্চিমবাংলায়। মূলত চাল ও কেরোসিনের অনটন ও চোরাকারবারকে কেন্দ্র করে বহুদিনের জমে থাকা ক্ষোভ, ক্রোধ ও ঘৃণা আছড়ে পড়ে কংগ্রেস সরকারের ওপর ।'' (দিবারাত্রির কাব্য, দ্বাদশ বর্ষ, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, ২০০৪, পৃষ্ঠা ১০০)

সাহিত্য জীবনের সঙ্গে ব্যাক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক জীবন পরস্পর সমান্তরাল অন্বিষ্ট থেকে তৎকালীন সময় সমৃদ্ধ হয়ে উঠছিল। ১৯৬৭ সালের বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেস সরকারের পতন হলেও কোনো দলই নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়নি। যুক্তফ্রন্ট সরকার ও রাজ্যপাল ধরমবীরা যক্তফ্রন্ট সরকারকে বরখাস্ত করেছিল। যুক্তফ্রন্ট বৃহত্তর আন্দোলন চালিয়ে গিয়েছিল সেই সময়। তৎকালীন কমিউনিস্ট সোমনাথ লাহিড়ির সঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় নিয়মিত সভা, মিছিল, বক্তৃতা ও আন্দোলনে আত্মনিয়োগ করেছিল। এবশ১৯৬৭ সালে আইন অমান্য করে তিনি আবার কারাবরণ করেছিলেন। সেই সময় তিনি তেরোদিন কারারুদ্ধ ছিলেন। সেই সময় রাস্তকেই জীবনের একমাত্র পথ করে নিয়েছিলেন তিনি। সাহিত্যে তিনি সমষ্টি মানুষের মঙ্গল কামনা তাঁর সাহিত্যে প্রতিফলিত করতে থাকেন। রাজনৈতিক গণআন্দোলনে সেই সময় কারাবরণ করে তিনি একই সেলে, কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়,যুক্তফ্রন্টের মন্ত্রী প্রকাশ দেওরাই, প্রবীণ গান্ধীবাদী অরুণ ঘোষ, কমিউনিস্ট নেতা এ. এম. ও. গণি, সি. পি. আই. এম নেতা সুধীর ভান্ডারী, ফরওয়ার্ড ব্লক নেতা শৈলেন দে, আজকের রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যাক্তির সঙ্গে ছিলেন। তৎকালীন প্রশাসন অত্যন্ত আতঙ্কিত হয়ে অসম্ভব দমন-পীড়ন নীতি গ্রহণ করেছিল। এ প্রসঙ্গে অরিন্দম সেন তাঁর 'নকশাল দমন অভিযান: ঐতিহাসিক রাজনৈতিন পরিপ্রেক্ষিত' (চেতনা পত্রিকা, বিশেষ ক্রোড়পত্র, ১ম বর্ষ) নিবন্ধে 'শ্যাওলা: অবসান পর্বের বিষাদ' শীর্ষক অধ্যায়ে লিখেছেন —'' শাসক শ্রেণী দুটো জিনিস পরিষ্কার বুঝতে পারছিল। প্রথমত: তারা আর পুরোনো কায়দায় শাসন চালাতে পারছে না। নিজেদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বাড়ছে। ফলে আদি ও বিশ্বস্ত প্রতিনিদি কংগ্রেস পার্টির মধ্যেও ঘনিয়ে আসছে ভাঙন (যা আনুষ্ঠানিক রূপ নিয়েছে ৬৯ সালে)। উপরন্তু স্বাধীনতা এনে দিয়েছি — একথা বলে জনগণকে আর ভোলানো

যাচ্ছে না। ..... মিশ্র অর্থনীতি নামক সোনার পাথর বাটি কোন প্রত্যাশাই পূরণ করতে পারেনি। ..... দ্বিতীয়ত: তারা লক্ষ্য করেছিল যে সাধারণ মানুষ আর পুরনো ভাবে মরে বেঁচে থাকতে রাজী নন, তারা বরং মানুষের মত বাঁচার জন্য মরতে প্রস্তুত আছেন। ৫৭ সালে কেরালায় কমিউনিস্ট সরকার গঠন, ৫৯ সালে কলকাতায় কৃষকদের মিছিলে গুলিবর্ষণ ও ৮০ জনকে হত্যা — প্রভৃতি ঘটনায় সমগ্র ষাটের দশক জুড়ে গণআন্দোলনের ঝড় ক্রমশ উত্তাল হয়ে উঠছিল। ৬০ সালে স্বত:স্ফুর্ত ভারত বনধ, ৬১ সালে মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বোম্বাই বন্ধ ও 'দমদম দাওয়াই' পশ্চিমবঙ্গের নানা স্থানে এবং কলকাতায় ট্রাম ভাড়া বৃদ্ধির বিরুদ্ধে জঙ্গী আন্দোলন — এ সবের মধ্যে জনগণের সংগ্রামী সংকল্প ও আত্মত্যাগের মানসিকতা বারবার ফুটে উঠেছিল। এবং পরে ৬৬ সালে আছড়ে পড়ল খাদ্য আন্দোলনের ঢেউ। ভারত-পাক যুদ্ধের পর তখন কেরোসিন তেলেরও অভাব — তেলের লাইনে দাঁড়িয়ে পুলিশের গুলিতে প্রাণ দিলেন তরুণ ছাত্র বসিরহাটের নুরুল ইসলাম। কৃষ্ণনগরে মিছিলে শহীদ হলেন আনন্দ হাইত। এরই ঠিক এক বছরের মাথায় ঘটে গেল নক্সাল বাড়ি। ষাট দশকের গরম হাওয়া ৬৭র গ্রীষ্মে কালবৈশখীর বজ্র বিঘোষে পরিণত হল। ..... আন্দোলনের ধারাবাহিক যোগসূত্রটা ধরতে শাসক শ্রেণী ভুল করেননি। দ্বিগুণ আতঙ্কিত হয়ে দমন নামল ..... চেষ্টা করল বিষবৃক্ষকে অঙ্কুরে বিনাশ করতে। কিন্তু পারল না। কারণ নক্সালবাড়ীর শিকড় শুধু ষাট দশকেই নয় আরো গভীরে প্রোথিত হল। শুধু পশ্চিমবঙ্গে নয় সারা ভারতে ছড়ানো ছিল। (উপন্যাসের ঘরবাড়ি-জহর সেন মজুমদার, প্রথম প্রকাশ ২০০১, পুস্তক বিপনি, পৃষ্ঠা ২৯৫-২৯৬)। নক্সাল আন্দোলন সেকালের বাঙালী মানসে প্রবল নাড়া দিয়েছিল —"..... সশস্ত্র কৃষি-বিপ্লবের এই রাজনীতি কার্যত এতবিৎকালের লালিত সমাজ সম্পর্কিত সমস্ত প্রকার চিন্তাচর্চার মূল ধরে নাড়া দিল।" (নকশালবাদী আন্দোলন ও বাংলা সাহিত্য; প্রথম প্রকাশ ১৩৮৮, দ্বিতীয় মুদ্রণ, বামাচরণ মুখোপাধ্যায়, করুণা প্রকাশনী, ভূমিকা অংশ,পৃষ্ঠা ১)

ভারতের রাজনৈতিক আবহ তখন উতপ্ত। ১৯৬২ সালে চীনের ভারত আক্রমণ কবি-মনকে চঞ্চল করে তোলে। ১৯৬৪তে কমিউনিস্ট পার্টির দ্বিধাবিভক্তি কবি সুভাষের রাজনৈতিক জীবন দর্শনের ওপর আঘাত নিয়ে আসে। কবির মত ও বিশ্বাস চিড়ে যাবার পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ভারতের অভ্যন্তরে মাওবাদী জীবনদর্শন ভারতের বুকে বারুদ নিয়ে প্রচন্ড গতিতে জনসাধারণের ওপর থাবা বসায়। এই সময় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টিতে তাত্ত্বিক ও সাংগঠনিক নীতির পরিবর্তন ঘটে। পার্টিতে গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে রণদিভে নীতি। পার্টিতে নীতি ও পদ্ধতি বদলাতে থাকে ঘন ঘন। ভারতীয় রাজনীতিতে

নেতা বি. টি. রণদিভে, চারুমজুমদার, প্রমোদ দাশগুপ্ত, হরেকৃষ্ণ কোঙার প্রমূখ নেতৃত্বের গ্রহণীয় মাওবাদ বিকশিত হয়ে ওঠে। ভারতীয় রাজনৈতিক আবহে দেখা দেয় অবিশ্বাস, ঘৃণা, বিদ্বেষ, কুৎসা, সন্ত্রাস ও সংকীর্ণ বিভেদ নীতি।

এই দশকেই নকশাল বাড়ি আন্দোলনের হিংস্র কার্যকলাপে কবিআত্মা বিচলিত হয়ে ওঠে। ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধ কবির সৃষ্টিশীল মনকে আঘাত করে। ১৯৬৬ সালের পশ্চিমবঙ্গের খাদ্য আন্দোলন, ১৯৬৭ সালে যুক্ত ফ্রন্ট সরকারকে অগণতান্ত্রিক ভাবে ভেঙে দেওয়া, ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তি সংগ্রাম, ১৯৭৫ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতি ইন্দিরা গান্ধীর অন্তর্বর্তী কালীন জরুরী অবস্থা, ১৯৭৭ সালে ভারতে অকংগ্রেসী হিসেবে প্রধানমন্ত্রী মোরারজী দেশাই-এর আবির্ভাব প্রভৃতি ঘটনায় এই সময়কালে কবি অত্যন্ত ক্ষুব্ধ, বিচলিত ও সংগ্রামী হয়ে ওঠেন। সন্ত্রাস, হিংসা, বিরোধ, ভাঙন, শত্রুতার প্রতিরোধ করার জন্য কবি উদ্দীপ্ত চেতনায় লেখেন — 'সাহস থাকে / দরজা ঠেলে ঢোকো / সর্বনাশ, রোখো! / কপাট ধ'রে দাঁড়িয়ে আছে / বিশাল থাবায় বাগিয়ে বাঘনখ / . . . . . হিংস্র নরখাদক / এই বুঝি দেয় লাফ / ও কিছু নয় / ভেতরে এসো, পাপোশে মোছো ভয় / গা ডুবিয়ে ফুলদানিতে / দেখ, তোমাকে ডাক দিচ্ছে / হাত ছানিতে / রক্তবরণ শঙ্কাহরণ গোলাপ।'' (শের জঙ্গ-এর ডেরায় / একটু পা চালিয়ে ভাই)

মানুষের সামনে উপস্থিত সমূহ সর্বনাশ। 'হিংস্র নরখাদক' সন্ত্রাশ ও বিভেদের জিগির তুলে মানুষকে বিপন্ন করতে চাইছে। এই সর্বনাশকে প্রতিরোধ করার জন্যে কবি সুভাষ মানুষকে এগিয়ে আসার আহ্বান করেছেন আলোচ্য কবিতায়। মানুষ চাইছে সংগ্রামী আত্মাকে — যে সংগ্রামে সে জয় করে নিতে পারে লক্ষ হৃদয়, যেখানে একটি মাত্র সাহসী পদক্ষেপে ফুল ফোটানো সৌরভ ছড়িয়ে পড়তে পারে। তাই কবি সেই নরখাদকদের প্রতি ঘৃণা, অন্যদিকে বিপন্ন মানবাত্মাকে জাগিয়ে তোলার জন্য আহ্বান করেন। সংগ্রামের মধ্য দিয়ে ব্যক্তি মানুষের একটি মাত্র পদক্ষেপ লক্ষ জনের সমষ্টি মানুষের উপকার উপহার রূপে সফল হতে পারে। শান্তির পক্ষে চলাই হল সেই সব নরখাদকের প্রতিরোধের উপায়। সাহিত্য-শিল্প-সংস্কৃতিতে মানুষ উৎকর্ষ আনয়নের প্রচেষ্টায় অংশ নিলে হিংস্র ও সন্ত্রাসবাদী মানুষের পরাজয় নিশ্চিত হবে। কেননা, কবি বহুরূপে সর্বসাধারণের অভিমুখ নিশ্চিতরূপে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন সেদিন। এজন্য তিনি লেখেন ''জীবনে বনে রণে রমণে লড়াই বহুরূপী।'' লড়াই করার সাহস আর শান্তির চেতনায় মানুষ জয় করে নিয়েছে কারাগার, ভয় ও যাবতীয় অত্যাচারকে।

এই সময়কালে কবি বাইরের জগৎ থেকে একা হয়ে পড়েন। অন্তরে সম্মিলিত সংগ্রামী চেতনা জাগিয়ে তোলার প্রয়াসী ছিলেন। এ রাজ্যে তখন বামফ্রন্ট ক্ষমতায়। কিন্তু শাসক দলের কাছে তাঁর প্রত্যাশা পূরণ হয় নি। একেবারেই ব্যক্তি স্বার্থহীন জনদরদী এই কবি ও কর্মীর প্রত্যাশা সরকারের কাছে হতাশার রূপ নিয়েছিল সেদিন। সেজন্য তিনি স্বেচ্ছা নির্বাসন নিয়েছিলেন ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি থেকে। তিনি সি. পি. আই. এম. পার্টির সদস্য পদ আর নবীকরণ করান নি। উপরন্তু কংগ্রেসের কয়েকটি জনসভা তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতিবাদী মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন। এই থেকে তিনি সি.পি.আই.এম. পার্টির কাছে অচ্ছুৎ হয়ে যান। সেই সময়ে পার্টির নেতৃত্বের কাছে একটা প্রশ্ন থেকেই যায় — কবি সুভাষ কি সেই সময়ে কংগ্রেসের সদস্যপদ নিয়েছিলেন। এখন যদিও পার্টি বদল জনমানসে একটি স্বাভাবিক রীতি হয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সময় বামফ্রন্ট নেতৃত্ব মেনে নিতে পারে নি। রাজনৈতিক বিষয়টি এড়িয়ে কবির সৃজনী কথা ও জনকল্যাণমুখী কর্মপ্রয়াস লক্ষ্য করলে জীবনদর্শনে অবিচল বলে আমাদের মেনে নিতেই হয়।

কবির ব্যক্তি জীবনে পার্টির নেতৃত্ব ও সরকারের কর্মসংস্কৃতির অভাব এক বিরাট ক্ষতের সৃষ্টি করেছিল সেই সময়ে। 'জল সইতে' (১৯৮১) কাব্যের কবিতাগুলিতে কবির ব্যক্তি মানসের ছাপ রয়েছে। গভীর আত্মবিশ্বাস নিয়ে আশাহত কবিমন রচনা করেন আলোচ্য কাব্যের কবিতাগুলি। এই সময়পর্বে কবি সমস্ত সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে জনকল্যাণকে ইপ্সিত বিষয় বলে মনে করেছিলেন। তিনি অদ্রিস বিশ্বাসকে এক সাক্ষাৎকারে স্বয়ং বলেছিলেন — ''আমি যে মঞ্চ পেয়েছি সে মঞ্চেই গিয়েছি, কংগ্রেস বলে নয়। এখন তো আর আমি কোনো মঞ্চ তৈরী করতে পারি না। কাজেই তৈরী মঞ্চতেই আমাকে যেতে হয়। শুধু কংগ্রেস নয়, আরো মঞ্চে আমি গেছি। আর আমি কংগ্রেসকে আচ্ছুৎ বলে মনে করি না। এক সময় মনে করতাম, এখন করি না। আমাদের পার্টিতে তার জন্য আমাকে নানা সময়ে জবাবদিহি করতে হয়েছে। এই যে সংকীর্ণতা বিভিন্ন দলে, তা শুধু কমিউনিস্ট পার্টির নয়, তা কংগ্রেসের মধ্যেও আছে, সেই সংকীর্ণতায় আমি বিশ্বাস করি না।''

সমকালের দেশ-সমাজ ও জনজীবনের গভীর সংকটের গভীরের তল স্পর্শ করেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সেকালের তরুণ যুবশক্তির প্রতি একদিকে তাঁর শিল্পী সত্তায় গভীর সহনুভূতিশীলতা অন্যদিকে কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের প্রতি ক্ষোভ ও ঘৃণার জন্ম নিয়েছিল। প্রশাসন ও পুলিশের প্রতি তাঁর শিলপীসত্তায় তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যঞ্জিত হয়ে উঠেছিল তাঁর সাহিত্যে। তৎকালীন জাতীয় রাজনীতি, জাতীয় সংকট ও জনজীবনের প্রতি চেতনাসম্পন্ন তাঁর হৃদয়ের গভীর থেকে উত্থিত

কাব্য 'এই ভাই ' (১৯৭১) ও 'ছেলে গেছে বনে' (১৯৭২)। এই সত্তুরের দশকে অভিজ্ঞ স্রষ্টার লেখনীতে সৃষ্টি হয়েছিল 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯) কাব্যগ্রন্থ, 'নাজিম হিকমতের আরো কবিতা' (১৯৭৯) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'পাবলো নেরুদার কবিতাগুচ্ছ' (১৯৭৩) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ, 'রোগা ঈগল' (১৯৭৪) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , হাংরাস (১৯৭৩) উপন্যাস , 'কে কোথায় যায়' (১৯৭৬) উপন্যাস , 'ক্ষমা নেই' (১৯৭১) গদ্য নিবন্ধ গ্রন্থ , 'ভিয়েতনামে কিছুদিন' (১৯৭৪) গদ্য নিবন্ধ গ্রন্থ , 'চে গেভারার ডায়েরী (১৯৭৭) অনুবাদ গদ্য নিবন্ধ গ্রন্থ , 'ইয়াসিনের কলকাতা' (১৯৭৮) ছোরদের জন্য গদ্যগ্রন্থ প্রভৃতি। এই সময়ই প্রকাশিত হয়েছিল 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা (১৯৭০), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ প্রথম খণ্ড (১৯৭২), সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসংগ্রহ দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৭৪), 'পদাতিক' প্রথম বাংলাদেশ সংস্করণ (১৯৭৪) এবং সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কাব্যসঙ্কলন(১৯৭৫) বাংলাদেশ সংস্করণ।

সত্তুর দশকে সৃষ্ট সাহিত্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের জীবনঅভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। কেননা ''শিল্পী এক প্রবল তাড়নায় নিজের চৈতন্য দিয়ে জানা বোধকে পাঠকের মধ্যে সঞ্চারিত করতে সচেষ্ট হন। ..... সাহিত্যে বিষয় নির্মাণে, তার রূপসৃষ্টিতে শিল্পীর স্বভাব যেমন সংযুক্ত হয়, তেমনি তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যাতিরেকে ভাষাও নির্মিত হয় না,তাকেও গড়ে তুলতে হয়। তাই একদিকে বিষয় অনুযায়ী ভাষা নির্মিত হয়, অন্যদিকে শিল্পীর নিজস্বতাও সেই ভাষায় প্রতিফলিত হয়। আবার শিল্পীর অভিজ্ঞতাও ভুঁইফোর কোন কিছু নয়, তাও নির্দিষ্ট কালখণ্ড ও বিশেষ পরিসর থেকেই গড়ে ওঠে।'' (উপন্যাসের নানা স্তর - প্রসুন ঘোষ, প্রথম প্রকাশ, কেবং মুশায়েরা, পৃষ্ঠা ১১) এই দশকে সাহিত্য সৃষ্টির বিশেষ আবদানের জন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায় ১৯৭৭ সালে 'আন্তর্জাতিক লোটাস পুরস্কার'-এ সম্মনিত হয়েছিলেন।

জগৎ ও জীবন অভিজ্ঞতায় ক্রমশ: সমৃদ্ধ ও পরিণত হয়ে ওঠে তাঁর সাহিত্য সম্ভার। ক্রমশ তিনি বাংলা সাহিত্যের সম্ভারকে সমৃদ্ধ করে সত্তুর দশকে যেসব শিল্প নির্মাণ করেছিলেন তাতে তাঁর জীবনপ্রত্যয়, স্বপ্নময় নতুন জগৎ, বলিষ্ঠ চেতনা কালের ধ্বংসস্তুপের ওপর অবিচল থাকার সাধনা — ''সত্তর দশক ছিল একটা ভয়ার্ত কঙ্কাল সময়, বিশ্বাস-অবিশ্বাস-সংশয় সব নিয়ে শুরু থেকে কবিদের হাঁটতে হয়েছে ভয়ংকর এক আগুনের মধ্যে দিয়ে। নকশাল আন্দোলনের সর্বগ্রাসী সংক্রামকে সকলেই যে কবিতার উপাদান হিসেবে ছেঁকে নিয়েছিলেন তাঁদের উচ্চারণে তা হয়তো নয়, কিন্তু সময়ের একটা উত্তাল অভিমত টের পাওয়া গিয়েছিল তাঁদের অনেকের মধ্যেই, অল্পবিস্তর। স্তব্ধ হয়ে পড়েছিল

মূল্যবোধ, ভেঙে পড়ছিল বানিয়ে তোলা মিথের যাবতীয় নির্মাণ সুষমা, মাথা চাড়া দিয়ে উঠছিল আত্মসন্দেহ, অনিশ্চিত, সত্যভঙ্গ আর বিশ্বাসঘতকতা।'' (৭০ থেকে ৯০ -এর কবিতার বাঁকবদল ও তার উপাদান - সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়; বিশ শতকের কবিতা ভাবনা —সম্পাদনা কমল মুখোপাধ্যায়, প্রথম প্রকাশ, শিলীন্ধ্র প্রকাশন, পৃষ্ঠা ১৭২)

কমিউনিস্ট পার্টির সর্বক্ষণের কর্মী সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যাক্তিজীবনে ক্রমশ: সৃষ্টির জগতে একটু একটু করে লীন হতে থাকেন। পার্টির নেতৃত্বের বিরোধ বিভেদ, সংকীর্ণতা প্রত্যক্ষ করে নিজেকে আরো অধিক মানবিক চেতনা সমৃদ্ধ করে তুলেছিলেন। এর মধ্যে তিনি জাতীয় জীবনের গন্ডী পেরিয়ে আন্তর্জাতিক বৃহৎ জগতের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। ১৯৬০ এর দশকেই তিনি যুক্ত হয়েছিলেন 'অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন-এর কাজে। ট্রেড ইউনিয়নের স্থানান্তরে ব্যাক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায় সেই সময় থেকে অ্যাফ্রো-এশিয়ান শিল্পী সংঘের কাজে অধিক মননিবেশ করেছিলেন। এই সময় থেকে তিনি বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সাহিত্য সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন। এবং জগতের বিভিন্ন খ্যাতিসম্পন্ন শিল্পী সাহিত্যিকের কাছাকাছি এসেছিলেন। ফলে তার জগৎ ক্রমশ সাহিত্যকেন্দ্রিক হয়ে উঠতে থাকে। তিনি সাহিত্য সম্মেলনে আমন্ত্রিত হয়ে ১৯৬২ সালে যান কায়রো, ১৯৬৭ সালে বেইরুট, ১৯৭৩ সালে আলমাআতা, ১৯৭৮ সালে লয়ান্দা প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রে প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন। ১৯৭০ সালে তিনি দিললীর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতীয় প্রতিনিধি দলের সভাপতি পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। এবং এই আন্তর্জাতিক সম্মেলনী সংস্থার ডেপুটি জেনারেল সেক্রেটারির দায়িত্বভার সামলেছিলেন এই সূত্রে তিনি বিশ্বের খ্যাতিসম্পন্ন লেখক সাহিত্যিকদের মধ্যে তৎকালীন লেখক তুরস্কের নাজিম হিকমত, রাশিয়ার রসুল গামজাতভ, মির্জা ইব্রাহিম, ইয়েভতুশেঙ্কো, নিকোলাই প্রমুখ, জাপানী সাহিত্যিক হোতা আকাচি, ভিয়েতনামের কবি সাহিত্যিক তেহান, পাকিস্তানের ফয়েজ আহমেদ ফয়েজ প্রমুখ আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন ব্যাক্তিত্বের সঙ্গে তাঁর সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল। সত্তুরের দশকে ১৯৭১ এর বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, এই বছরের ১৪ই আগস্ট বঙ্গবন্ধু মজিবর রহমানের হত্যাকাণ্ড, ১৯৭৬ সালের ২৯শে আগস্ট ঢাকায় নজরুল ইসলামের ইহলোক ত্যাগ, ১৯৭৭ সালে ভারতের জরুরী অবস্থা তাঁকে উদ্দীপিত করেছিল। এই সময় তিনি দিল্লী সাহিত্য একাডেমীর কার্যনির্বাহী সদস্য হিসেবে কার্যভার বহন করছিলেন।

ক্রমশ: বিভিন্ন ঘটনায় ব্যক্তি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সঙ্গে সংস্পর্শ এড়িয়ে চলেছিলেন। এবং ১৯৮১ সালের থেকে তিনি পর্টির সদস্যপদ আর নবীকরণ করেননি। এরপর

থেকে তিনি রাজনৈতিক সীমারেখা উত্তীর্ণ হয়ে দলমত নির্বিশেষে ডান-বাম বিভেদের বাইরে রাজনীতিকে দেখেছিলেন। তাঁকে নিয়ে কমিউনিস্ট দলের ভেতরে গুঞ্জন ও সমালোচনার ঝড় উঠেছিল। বিভিন্ন দিক থেকে সমালোচনা তাঁর জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এমনও নয় যে তিনি সেসময় বা তারও পরে ভিন্ন কোন দল কিংবা ভিন্ন কোন মতের বশবর্তী হয়েছিলেন। তখন তিনি কমিউনিস্ট পার্টির হয়ে কাজ করার এক সময়ের অন্ধ অনুসরণ ও আবেগ অবশ্য সরে এসেছিলেন। পার্টির সংকীর্ণ গন্ডী থেকে বেরিয়ে এসে তিনি সেসময় যে মঞ্চই পেয়েছিলেন তাকে অচ্ছুৎ বলে মনে করেননি।তখন রাজনীতির অর্থ তাঁর কাছে সমাজ ও মানুষের মঙ্গল করাকে বুঝেছিলেন। তাঁর কথায় '' সমাজটা এমন হবে যাতে মানুষের ভাল হয়। কিন্তু, এটাও খুব রিলেটিভ। যে শ্রমিক কিছু কাজ না করে মজুরী নিচ্ছে, বোনাস পাচ্ছে, নানা রকমের সুবিধা পাচ্ছে — আমি তাকে সমর্থন করি না। কেননা, শুধু তার ভাল হওয়াটাই সব নয়। তাতে সমাজের ভাল হচ্ছে কিনা দেখা দরকার। এতে সমাজ আরো তলিয়ে যাচ্ছে। সুতরাং, মানুষের ভাল হওয়াটা পরিষ্কার করে দেখা দরকার ।''(অদ্রীশ বিশ্বাস-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকারে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের উক্তি ; সুভাষ মুখোপাধ্যায় : জীবন ও সাহিত্য, র‍্যাডিকেল ইম্প্রেশন ; দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০০২ পৃষ্ঠা ৪৮)

গ্রামবাংলা-মাঠ-ঘাট-নগর-প্রান্তর-কল-কারখানা-নদী-বন্দর জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে সাহিত্যিক সুভাষ মুখোপাধ্যায় ব্যক্তিজীবনে খুব কাছে থেকে দেখেছিলেন। এই সময়ের সাহিত্যে সেগুলি চিত্রকল্পরূপে শিল্পরূপ পেয়েছিল। কাব্য-কবিতার ছন্দ প্রয়োগ — ভাষা নির্মাণ ও প্রকাশ ভঙ্গিমায় পালাবদল ঘটেছিল এই সময়ের সাহিত্যে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের রচনায় লোকায়ত জীবন, প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ ও কাব্য সাহিত্যের গল্প-কাহিনীধর্মী কবিতা রচিত হয়েছিল এই সময়। রাজনীতিবোধে হতাশ সাহিত্যিকের শিল্পমানস সাহিত্যের গতিপথে নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের জলছাপ নিয়ে এই সময়ের সাহিত্য সৃষ্টি করেছিল। কাব্য-উপন্যাস-গদ্যনিবন্ধ-অনুবাদ-ছড়া শিল্পে সুভাষ মুখোপাধ্যায় চিত্রকরের মতো জীবনের ছবি আঁকছিলেন এই পর্বে। সত্য প্রতিষ্ঠা ও জনজীবনের মঙ্গলের জন্য তাঁর জীবন প্রত্যয় অটুট সেকালেও। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক শ্রীভূদেব চৌধুরী লিখেছেন —''ব্যাক্তি সুভাষও একান্ত দলের ছিলেন না কখনো। ছিলেন মানব সাম্যের জীবন সত্যের তুঙ্গাচলে নিবদ্ধ-দৃষ্টি। দল ওঠে -পড়ে, ভাঙ্গে-গড়ে, কিন্তু সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যয়ের দায়বদ্ধতা অবিচল। সেই সামর্থ্যেই তিনি কবি; তারই টানে সর্বশেষে অমন নিরেট যূথ-চ্যুত।'' (বাংলা সাহিত্যের ইতিকথা-শ্রীভূদেব চৌধুরী, চতুর্থ পর্যায় - দ্বিতীয় পর্ব, দে'জ পাবলিশিং, দ্বিতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৪৩২)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন জীবনপ্রত্যয়, জীবনসাম্য, জীবনসম্পৃক্ত, জীবনমুক্তি ও জীবনপ্রসঙ্গের শিল্পী। জীবনের শেষ পর্বের সাহিত্যে তাঁর জীবনচেতনা ও অটুট প্রত্যয় অধিক পরিণত ও শিল্পগুণসমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে রচিত তাঁর অন্যতম সাহিত্য হল —'জল সইতে' (১৯৮১) কাব্যগ্রন্থ , 'চইচই চইচই' (১৯৮৩) কাব্যগ্রন্থ , 'বাঘ ডেকেছিল' (১৯৮৫) কাব্যগ্রন্থ , 'যারে কাগজের নৌকো' (১৯৮৯) কাব্যগ্রন্থ ,'পাবলো নেরুদার আরো কবিতা'(১৯৮০), অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'হাফিজের কবিতা' (১৯৮৪) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'চর্যাপদ' (১৯৮৬) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'আমরু শতক' (১৯৮৮) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'গাথা সপ্তসতী' (১৯৮৯) অনুবাদ কাব্যগ্রন্থ , 'অন্তরীপ বা হ্যানসেনের অসুখ' (১৯৮৩) উপন্যাস, 'কাঁচা-পাকা' (১৯৮৯) উপন্যাস, 'তমস' (১৯৮৮) অনুবাদ উপন্যাস, 'আবার ডাকবাংলার ডাকে' (১৯৮১) গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ , 'অগ্নিকোণ থেকে ফিরে' (১৯৮৪) গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ , 'এখন এখানে' (১৯৮৬) গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ , 'খোলা হাতে খোলা মনে' (১৯৮৭) গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ , 'আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন' (১৯৮৭)জীবনস্মৃতি গ্রন্থ , 'আনা ফ্রাঙ্কের ডায়েরী' (অনুবাদ গদ্যগ্রন্থ - ১৯৮২) , 'ভারত স্বাধীন হল' (১৯৮৯) অনুবাদ গদ্যগ্রন্থ , 'মিউ এর জন্য ছড়ানো ছিটানো' (১৯৮০) ছড়ার গ্রন্থ , 'টো টো কোম্পানী' (১৯৮৪) গদ্যগ্রন্থ , 'রূপকথার ঝুড়ি' (১৯৮৮) শিশু কিশোরদের জন্য গদ্যগ্রন্থ , এবং নির্বাচিত গদ্য-পদ্যের বাংলাদেশ সংস্করণ 'বাংলা আমার বাংলাদেশ' (১৯৮৮)।

১৯৮০ দশকে সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ধারায় একজন স্বতন্ত্র ধারার সাহিত্যিকের সামর্থ্য অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিলেন। ক্রমশ বাংলা সাহিত্যের ধারায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যের ভাণ্ডারে সুভাষ মুখোপাদ্যায় একটি স্বতন্ত্র স্টিল হয়ে দাঁড়ায় । এ প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য সাহিত্য সমালোচক অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়ের বিবৃতি —'' .....তা একাধারে ব্যক্তিগত ও বিশ্বগত, লেখক-ব্যক্তিত্বের শিল্পসম্মত প্রকাশ। যেকোনো গদ্য রচনা বা কবিতায় লেখক ব্যক্তিত্বের এমন সব গুণ ও বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়, সেগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে দেখানো যায় না, অথচ অনিভব করা যায়, তাকে এককথায় বলা যায় —স্টাইল ।'' (বাংলা গদ্যরীতির ইতিহাস, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রথম দে'জ সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৯) তাঁর সাহিত্য বিভিন্ন সময় পুরষ্কারে স্বীকৃতি লাভ করেছিল — কুঁয়ারন আসান পুরষ্কার (১৯৮০), মির্জা তুরসুন জাত পুরষ্কার (১৯৮১), আনন্দ পুরষ্কার (১৯৮৩), সোভিয়েত ল্যান্ড নেহরু পুরষ্কার (১৯৮৪), মধ্যপ্রদেশ সরকারের কবীর পুরষ্কার (১৯৮৭), মোহিতলাল স্মৃতি পুরষ্কার (১৯৮৭), সুকান্ত স্মৃতি পুরষ্কার (১৯৮৭), উল্টোরথ পুরষ্কার (১৯৮৭), জ্ঞানপীঠ পুরষ্কার (১৯৯২),

বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'দেশীকোত্তম' উপাধিতে সম্মানিত করেছিল ১৯৯৩ সালে। তাঁর সাহিত্য সর্বমত, সর্বদল ও সর্বশ্রেনীর মানুষের হৃদয়ে কালজয়ী আসন দখল করতে সমর্থ হয়েছে।

কাব্য-উপন্যাস-গদ্যনিবন্ধ-রিপোর্টাজ ও ভ্রমণকাহিনীধর্মী রচনায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় সমকালীনতার উত্তাপ প্রকটিত করেছিলেন। মানুষ ও রাজনৈতিক দল তাঁর প্রতি বিশ্বাস রাখতে পারেননি অনেক সময়। কিন্তু মানুষের প্রতি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিশ্বাস ও প্রত্যয় ছিল দৃঢ়। এলদিকে সাহিত্যজীবন ও রাজনীতি অন্যদিকে জগৎ ও জীবনের শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জাতীয় জীবনের ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে সুভাষ মুখোপাধ্যায় একজন কর্মবীর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সাহিত্য হয়ে উঠেছে মানুষের হৃদয়ের আমৃতের সন্ধান । বিদগ্ধ সাহিত্য সমালোচক ক্ষেত্রগুপ্তের কথায় — ''একটা দেশের জাতির বাস্তব জীবন এবং ঐতিহাসিক পরিবাশের মধ্যদিয়ে তার সাহিত্য বিশিষ্ট জাতীয় চরিত্র পায় । বিশেষ করে তার সাহিত্য যদি তার প্রাণের অংশ হয়ে উঠতে পারে।'' (বাংলা উপন্যাসের ইতিহাস, প্রথম খন্ড, ক্ষেত্রগুপ্ত , প্রথম প্রকাশ , গ্রন্থনিলয় , পৃষ্ঠা ১৭) ।

সুভাষ মুখোপাধ্যায় আজীবন প্রতিকূলতা, বন্ধর ও দুর্গম পথ অতিক্রম করে নিম্নবর্গ ও মধ্যবিত্তের জীবন সংগ্রামের প্রতি আশাবাদকে প্রজ্জ্বলিত করেই হেঁটে চলেছিলেন। কায়েমীস্বার্থ, সুবিধাভোগী, স্বার্থান্বেষী শাসক শ্রেনীর প্রতি তাঁর সাহিত্য সর্বদা প্রতিবাদী ও উচ্চকিত বলিষ্ঠ কণ্ঠে বজ্রনির্ঘোষ হয়ে কথা বলেছে। ব্যক্তি জীবনের প্রতিকূলতা, প্রতিবন্ধকতা, সমালোচনাকে পাথেয় করে তিনি অত্যন্ত সহজ ভাষায় সাবলীলভাবে সৃষ্টির প্রতিমা নির্মাণ করে চলেছিলেন। ক্রমশ: মানুষের জয়গান করতে করতে তিনি হয়ে উঠেছিলেন মৃত্যুঞ্জয়ী পদাতি। তিনি বাংলা সাহিত্যের ধারায় কালের গন্ডীকে অতিক্রম করে বিশিষ্ট জীবনবোধ ও প্রত্যয়ী চেতনায় আজো আমাদের হৃদয়ে পদধ্বনি তুলে চলেছেন নি:শব্দে, নীরবে।

তিনি দেশপ্রেম ও স্বপ্নকল্পে মানবতার উত্থানের আদর্শে তন্নিষ্ঠ থেকেছিলেন। মানুষের বেদনা, আর্তের কান্না, নিপীড়িতের বেদনা ও নারীর অবমাননায় প্রতিবাদী হয়ে উঠেছিলেন। এ প্রসঙ্গে কবি শঙ্খ ঘোষ যথার্থই লিখেছেন —''রসে বশে 'অজাতশত্রু বোবা' হয়েও থাকতে চাননি তিনি, দরকার মতো তাঁকে করতেই হয়েছে সমালোচনা, তুলতেই হয়েছে রাজনীতির কথা, বলতেই হয়েছে ক্ষমতার বিরুদ্ধে, গদি আর গদিয়ানদের বিরুদ্ধে, আর সেই জন্যে শুনতে হয়েছে অবিরাম: 'ভেবেছে কী! এসব কী লিখছে সুভাষ মুখুজ্যে!'' (দিবারাত্রির কাব্য, প্রথম ও দ্বিতীয় সংখ্যা, দ্বাদশ বর্ষ, ২০০৪, পৃষ্ঠা ৫৩)। তাঁর জীবনবোধ, ব্যক্তিজীবন, আদর্শবোধ ও দেশপ্রেমের সঙ্গে সাহিত্যের সম্পর্ক ছিল অবিচ্ছেদ্য। এ সম্পর্কে সাহিত্যিক গোপাল হালদার আলোকপাত করেছিলেন —''জীবনযাত্রার গোড়ার কথা আগে জানতে হয়, তবেই বোঝা সম্ভব সাহিত্যে তার প্রতিফলন কতটা পড়েছে প্রত্যক্ষ, কতটা পরোক্ষ; —

কতটা পড়েছে সৃষ্টির মৌলিক নিয়মে অনুরঞ্জিত, কতটা পড়েছে ব্যক্তি-মানসের মধ্যদিয়ে কুব্জ হয়ে বা ন্যুব্জ হয়ে।'' (বাঙলা সাহিত্যের রূপরেখা, প্রথম খণ্ড, গোপাল হালদার, অরুণা প্রকাশনী, তৃতীয় মুদ্রণ আরুণা সংস্করণ , পৃষ্ঠা - চ)

সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে সময় গড়িয়ে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন জীবনের অন্তিম পর্বে। এই রচিত সাহিত্যের মধ্যে অন্যতম হল —'ধর্মের কল' (১৯৯১) কাব্যগ্রন্থ , 'একবার বিদায় দে মা' (১৯৯৫) কাব্যগ্রন্থ , 'কমরেড কথা কও' (১৯৯০) উপন্যাস, 'সাতসকালের ছড়া' (২০০০) ছড়ার গ্রন্থ , 'ছড়ানো ঘুঁটি' (২০০০) কাব্যগ্রন্থ , 'বক্‌বকম্' (২০০১) ছড়ার গ্রন্থ , 'হরেকরকমবা' (২০০৩) ছড়ার গ্রন্থ , 'কুড়িয়ে ছিটিয়ে' (১৯৯০) গদ্যনিবন্ধ গ্রন্থ , 'কবিতার বোঝাপড়া' (১৯৯৩) গদ্যগ্রন্থ , 'টানাপোড়েনের মাঝখানে' (১৯৯৪) গদ্যগ্রন্থ , 'ঢোলগোবিন্দের মনে ছিল এই' (১৯৯৪) জীবনী গ্রন্থ , 'জানো আর দ্যাখো জানোয়ার' (১৯৯১) গদ্যগ্রন্থ , 'এলাম আমি কোথা থেকে' (১৯৯১) গদ্যগ্রন্থ প্রভৃতি। এই নব্বই এর দশকে প্রকাশিত হয়েছিল কবিতা সংগ্রহের পাঁচটি খণ্ড কলকাতা দে'জ পাবলিশিং থেকে। ১৯৯৩ সালে প্রকাশিত হয়েছিল 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রেমের কবিতা' কাব্যগ্রন্থটি। বাংলা সাহিত্যের ধারায় সুভাষ মুখোপাধ্যায় কালজয়ী উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কের ন্যায় একজন স্রষ্টা হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সাহিত্যের মূল্যায়ণে সমালোচক ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায় যথার্থই মন্তব্য করেছেন — ''রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার জগতে সুভাষ মুখোপাধ্যায় এক বলিষ্ঠ কবি ব্যক্তিত্ব। অনুভূতির দীপ্তি ও অভিজ্ঞতার আলোকশিখা তাঁর কবিতাকে সমকালীন অন্যান্য কবিদের বৃত্ত থেকে অন্য এক মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করিয়েছে। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বোধগত আন্তরিকতা ও প্রকাশগত প্রগতিশীলতার দিকে বাংলা কবিতার যাত্রা পথ সুভাষ মুখোপাধ্যায় সম্ভবত প্রথম সার্থক ও পূণাঙ্গ কবিব্যক্তিত।''(কবি এবং কবিতার বিষয় -আশয়, ধ্রুবকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, পৃষ্ঠা ৩৫০-৩৫১)

সুভাষ মুখোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্যে নিরন্তর স্বপ্নের আত্মপ্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ী ছিলেন। তাঁর ব্যক্তিক সমস্যা ও সামাজিক চলমান সমস্যাগুলিকে শিল্পের সমস্যার সঙ্গে একই প্রেক্ষিতে স্থাপন করেছিলেন তিনি। তাঁর সাহিত্য সাধনা সময়ের হাত ধরেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। তাঁর সময়চেতনা ও সাহিত্য সাধনার সঙ্গে বিদগ্ধ সমলোচক সরোদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মন্তব্য প্রনিধানযোগ্য —''পৃথিবীজোড়া একোলজিক্যাল ব্যালান্স নষ্ট করার কারণ আমরাই। আবার দূষিত পরিবেশের মাঝখানে দাঁড়িয়ে বিশুদ্ধতার সাধনাও তো আমাদেরই। ..... এখানে প্রত্যেক লেখকই যেন সময়ের হাতে লাঞ্ছিত অস্তিত্বের বেদনায় অস্তির। সময় তো অস্থির হবেই। যে-কোনো ইতিহাস জিজ্ঞাসুই জানেন প্রতিটি কালখণ্ড কালান্তরের আবেগে স্পন্দমান। কিন্তু আজকের সচেতন মানুষের অস্থিরতার অর্থটা আরো

একটু গভীর। আমাদের লেখকরা একবিংশ শতকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ বোধহয় অনুভব করছেন ব্যক্তিক নিরুপায়ত্ব, গত্যন্তরহীনতা। সুনীল যাকে বলেছেন 'ব্যাখ্যাহীন অস্থিরতা' আর সমরেশ যাকে বলেছেন আত্মানুসন্ধানের 'নৈতিক ও মানসিক আর্তি' এ দুইয়েরই মূলে আছে বাইরের দিক থেকে প্রযুক্তিপারঙ্গম অথচ অন্তরের দিকে নিষ্প্রদীপ ব্যক্তির নিজেকে খুঁজে ফেরা। এই অভিজ্ঞান সন্ধানের যন্ত্রণা নানা লেখকের কাছে নানা মাত্রায় মূর্তি ধরেছে।'' (বাংলা উপন্যাসের কালান্তর, সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং, পরিবর্ধিচ ও পরিমার্জিত তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৯৫ পৃষ্ঠা ৩৩৯-৩৪০) সুভাষ মুখোপাধ্যায় যুব-জনচিত্তের হতাশা, অনন্বয়, অনিকেত অসহায়তা, নিস্ফলত্ব,বিষাদগ্রস্ত ও ভঙ্গুর মনকে স্বপ্নময় জগৎ নির্মাণে উৎসাহিত করে, সাহস ও উদ্দীপনার সঞ্চার করতে, আলোর দিশা দিয়ে তাদের হৃদয়ের কাছের শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন।

মানুষের কান্না, অধ:পতন, মানবতার লঞ্ছনা, বঞ্চনা, শোষণ, পীড়ন ও বেদনার ভেতর দিয়ে শান্তি, সাম্য ও জাগরনী সুরের ছন্দে ও বলিষ্ঠ জীবনবোধে মানুসের প্রত্যয় ও স্বপ্নময় জগতের ঠিকানা দিয়েছিল সুভাষ মুখোপাধ্যায়। সাহিত্যে প্রতিষ্ঠিত তাঁর মানবচেতনা, সমাজসচেতনতা ও দায়বদ্ধ শিল্পীসত্ত্বার জন্য তিনি কালজয়ী শিল্পী হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর সাহিত্যে প্রতিষটিত তাঁর ব্যক্তিসত্ত্বার দৃঢ় প্রত্যয়, গভীর জীবনসক্তি, তীক্ষ্ম বাস্তব সচেতনতা, আদর্শিক জীবনবোধ, অর্থনৈতিক চেতনা, আপাত সাফল্যকে অগ্রাহ্য করে নতুন পথে হাটবার দু:সাহসিকতা, সমালোচনার মুকুটের কন্টকাকীর্ণতাকে বহন করে সত্যনিষ্ঠায় আপনসীমাকে উত্তীর্ণ হবার আন্তরিকতা বাংলা সাহিত্যের ধারায় তাঁকে বিশিষ্টতা দান করেছিল। এই কর্মযোগীর সৃষ্টিকর্ম জনজাগরণের ও জনপ্রিয়তার অন্ত:মূলে পদচারণায় সফল।

বার্ধক্যে কবিকে পীড়া দেয় একাকীত্ব। স্বাভাবিক সময় হয়ে ওঠে পীড়াদায়ক। কবির এই কঠিন সময় হয়ে ওঠে রাক্ষুসী। কবি 'চইচই-চইচই' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'অন্ধকারে' শীর্ষক কবিতায় তাঁর এই বিচ্ছিন্ন একাকী জীবনকে তুলে ধরেছেন। সেকালে মানুষের মধ্যে আন্তরিকতা, সহমর্মিতা, সহানুভূতিহীন এক বিচ্ছিন্ন জীবনের অভিমুখ লক্ষ্য করেন কবি সুভাষ। তাঁর এই উপলব্ধি এবং সামাজিক মানুষের আত্মকেন্দ্রিক স্বার্থপরতায় কবি দুঃখিত। কবি সঙ্ঘবদ্ধ ও শ্রেণী সংগ্রামে বিশ্বাসী। অথচ একজন থেকে অন্যজন বিচ্ছিন্ন এমন এক অন্ধকার পথে চলমান মানুষকে প্রত্যক্ষ করছেন কবি। এই উপলব্ধি থেকে কবি লেখেন —

''যার যার নির্জন কুঠুরিতে
তখন সবাই আমরা বন্দী,

সমস্ত সুন্দর মুখ তখন
কালো বোরখায়,
ঢাকা প'ড়ে যায়।
সমস্ত অক্ষর আড়াল ক'রে
দাঁড়িয়ে থাকে —
মুন্ড গ্রীবাহীন এক নির্বোধ কবন্ধ,
উদরে যার মুখ,
আর সেই মুখমন্ডলে বসানো
অগ্নিবর্ষী একটিমাত্র চোখ।''(অন্ধকারে /চইচই - চইচই)

মানুষের মৃত্যুর পর জীবনের নানা ছবি নানা ভাষায় কথা বলে। আবার কোনো কোনো চরিত্রের মৃত্যুতে মুখরোচক খবর মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। 'চইচই -চইচই' কাব্যের অন্তর্ভুক্ত 'মুখরোচক' শীর্ষক কবিতাটিতে পাপ-পুণ্য নয়, একটা মানুষের মৃত্যুর পরের সত্য ছবি আঁকার প্রয়াস লক্ষণীয় বিষয় হয়ে উঠেছে এখানে। একজনের কাছে গৃহকর্ম সর্বক্ষণ নিপুণ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হওয়া চাই। এজন্য কবি বলেন — ''ফুলঝাড় তার হাতের থাবায়/ বগলদাবায় পাশে'' সর্বদাই দেখা যায় প্রায়। এতটুকু ধুলোময়লা তাকে ছুঁতে পারে না। তার ধারণা ঘরকন্নায় তার মতো ঝানু আর দ্বিতীয়টি কেউ নেই। যেন মানুষ যত পাপ করুক না কেন সে যেন একাই সব সাফ করে দিতে পারে। তারপর একদিন সহসা সে এই জগৎ থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে গেল। এই অসাধারণ জীবন চরিত্রের নানা কথা, মুখরোচক খবর হয়ে ভাসতে থাকলো এক মুখ থেকে অন্য মুখে। তখন খবরটাই থাকল। সেটাই সত্য হয়ে থাকল। এই সত্য বাস্তবতার আনন্দ-বিষাদপূর্ণ কবিতা 'মুখরোচক'-এ শিল্পিত মাধুর্য্যে নির্মাণ করেছেন কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়।

কবি পথ চলেন আর ''মশালের মুখে/ কথা-দিয়ে-কথা -জোড়া টগবগে লাল ঘোড়া।'' ছুটিয়ে চলেন। নিজের ঘরে বসে দুটো কথা বলার ফুরসৎ যেন তাঁর নেই। স্ত্রী-কন্যার সঙ্গে আলাপ ও সঙ্গ সুখ যেন তাঁর জন্য ছিল না। এটা কখনো কখনো তাঁর নিজের কাছেই বর্বর বলে মনে হয়েছিল। নিষ্ঠুর ও অমানবিক এই আচরণে তাঁর স্ত্রী কন্যা কত যেন কষ্ট পেয়েছিলেন। ঘর থেকে তাঁকে যেন তাঁর স্ত্রী বলেন — ''শোনো কথা, বর্বর ! / কবর তো নয়, / তোমারই জন্যে / আমি কথা দিয়ে / বানিয়েছি এই ঘর।'' এই উপলব্ধি কবির নিতান্ত নিজের একার। কখনো কখনো আত্মোপলব্ধি থেকে মনে হয়েছিল — সংসার, স্ত্রী, কন্যার প্রতি সে অমানবিক বর্বর আচরণ করেছেন। কেননা সহায়-সম্বলহীন

হয়েও সে কেবল পথকেই একমাত্র সঙ্গী করে নিয়েছিল। এজন্য আলোচ্য কাব্যের অন্তর্ভুক্ত গৃহস্থ হও' শিরোনামের কবিতায় কবি লেখেন —''চালচুলোহীন, ওরে ও হা-ঘরে / বর্বর!/ কেন তুমি সম্বৎসর / শুধু ঘুরে ঘুরে / ক্ষয় কর ছয় ঋতু?''। কবি আত্ম বিশ্লেষণের ভঙ্গীতে আলোচ্য কবিতাটি লিখেছেন । এই কবিতায় তাঁর স্ত্রী, কন্যা ও পরিজনদের ত্যাগকে স্বীকার করেছেন কবি। চরম আর্থিক অনটনের মধ্যেও তিনি অর্থ সংগ্রহের প্রতি যত্নবান না হয়ে সারা জীবন প্রায় পথিক হয়েই চলেছিলেন। আত্মকথনের ভঙ্গীতে কবির অন্য কাছের মানুষের ভাবনার প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়।

যৌবন অনেকদিন আগেই অতিক্রান্ত হয়েছে কবির শরীর থেকে। বার্দ্ধক্যে পৌঁছে কবি তাঁর প্রিয়তমাকে স্মরণ করে বলেন যৌবন থেকে সরে এসে ''এখন অনেক দূর থেকে, /একা /মনে মনে বলছি আমি / ভালোবাসি।'' জীবনের অনেকটা সময় বিবাহিতা স্ত্রীকে উপেক্ষা করে বঞ্চনার মালা পরিয়ে বার্ধক্যে কবি অনুশোচনার গ্লানিতে ভুগেছিলেন। বৃদ্ধ কবি রোমান্টিক কল্পনায় প্রিয়তমাকে উদ্দেশ্য করে লেখেন — ''আমিও তোমাকে কাছে টানতে চাই /কলকল্লোলিত সে আবেগে। /তোমাকে জে কথা আমি বলতে গিয়ে /হার মেনে /ফিরে ফিরে আসি : /কানে কানে গুনগুন ক'রে বলা যেত /যদি আমি /হতাম ভ্রমর।'' (যা চাই / এই ভাই) কবি তাঁর প্রিয়তমাকে এ সংসারের সব কিছু অন্তরিকতার দৃষ্টিতে যাচাই করার আহ্বান করেছেন। তাঁর ভাষায় — ''এ সংসারে

দিনে রাত্রে
দেহ বলো, মন বলো
যখন যা চাই —
প্রেমের নিকষে ফেলে, প্রিয়তমা,
করো সব কিছুর যাচাই।।'' (যা চাই / এই ভাই)

চলার পথে আঘাত স্বাভাবিক। সেই আঘাত ও ঝঞ্ঝাকে মেনে নেবার মতো সহনশীলতা তাঁর মধ্যে ছিল। কোনো বিপর্যয় ও দুর্ঘটনায় একা বাঁচার মানসিকতা তাঁর ছিল না। তিনি পড়শি, পরিজনদের সঙ্গে নিয়ে বিপর্যয় মোকাবিলা করতে চেয়েছিলেন। মানুষের সঙ্গে থেকে মানুষের হয়ে, মানুষের কথা বলতে চেয়েছিলেন।

তাঁর সাহিত্য সৃষ্টির কথায় কবি-সহিত্যিক বুদ্ধদেব বসুর একটি প্রাসঙ্গিক বক্তব্য স্মর্তব্য — ''পারিপার্শ্বিক জীবনে ও সমাজে যা-কিছু অনুদার ও অশুভ, কুৎসিত ও নিষ্ঠুর, তার বিরুদ্ধে; ধর্মের, সমাজের ও সাহিত্যের অন্ধ সংস্কারের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা; আর সেই সঙ্গে প্রচলিত কাব্যরীতি ভেঙে-

চুরে নতুন রূপ ও রীতি-রচনা . . . . . কিন্তু প্রেরণা যেখানে সত্য, যেখানে বিশিষ্ট কবি-দৃষ্টি নিজস্ব রীতির সঙ্গে সংযুক্ত, সেখানে আমরা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার করি, স্বীকার ক'রে খুশি হই।'' (কালের পুতুল, বুদ্ধদেব বসু, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, তৃতীয় সংস্করণ, পৃষ্ঠা ৫৮)

জগৎ, জীবন, মানবিকচেতনা ও ভালোবাসায় তাঁর শিল্পীসত্তা অমর। কৃষক, শ্রমিক, নাপিত, তাঁতি, ধোপা, মজুর প্রভৃতি মানুষকে ভালোবেসে, দেশমাতার সেবায়, দুর্ভিক্ষপীড়িত, অনাহার ক্লিষ্ট আর্তের বেদনায় ব্যথিত স্রষ্টা অসাম্য, শোষণ, বঞ্চনা ও পীড়নহীন জগত নির্মাণের স্বপ্নে ও আশাবাদে দৃঢ় প্রত্যয়ী সুভাষ মুখোপাধ্যায় ২০০৩ সালের ৮ই জুলাই মঙ্গলবার সকালবেলা কলকাতা বেলভিউ নার্সিংহোমে আমাদের ছেড়ে ইহলোক ত্যাগ করেছিলেন। তিনি যা রেখে গিয়েছেন তা আমাদের জীবন -দেশ-সমাজ-সাহিত্য ও নতুন জগৎ গঠনের উদ্দীপনার আশ্রয়স্থল রূপে মহাকালের গতিতে শাশ্বতরূপ পদচারণা করে। তাঁর বিশিষ্ট জীবন বাংলা জীবনীসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য অনন্য সম্পদ।